শীয়া মতবাদ ও ইসলাম

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী

শীয়া মতবাদ ও ইসলাম

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী

কামেল (হাদীস), এম, এ, ডবল
প্রাক্তন অধ্যাপক, করাটিয়া কলেজ
ডিরেকটর, দারুল ইফ্‌তা

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ

মওলানা রুহুল আমীন

কামেল-বি, এ. লেসন্স (মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়)

দারুল ইফতা

১৫, গ্রীণওয়ে

মগবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ

জমাদিউস সানী ১৪০৪

চৈত্র ১৩৯০

মার্চ ১৯৮৪

মূল্য ঃ সাদা—দশ টাকা মাত্র

নিউজ—ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ আধুনিক প্রেস

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- শীয়া মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ (ক) সূচনা—১ (খ) শীয়াদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১ (গ) শীয়া মতবাদ—৩ (ঘ) রাষ্ট্রীয় অনুকূল্যে শীয়া মতবাদ—৩ (ঙ) শীয়াদের বিভিন্ন ফেরকা—৪ (চ) ইসনা আশারিয়া—৫
- শীয়া মতবাদের মূল ভিত্তি ঃ (ক) বুদ্ধি ও শারিয়াত—৭
- আল্লাহ সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ (ক) আল্লাহর আকার ও শরীর—১০ (খ) ইসনা আশারিয়াদের অভিমত —১১
- কুরআন সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ (ক) শীয়াদের কুরআন—১৩ (খ) কুরআনে বিকৃতির অপবাদ—২০ (গ) মূল কুরআন সঠিক ও অবিকৃত—২২
- হাদীস সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ (ক) শীয়া মতবাদে হাদীস—২৪ (খ) শীয়া হাদীস গ্রন্থ—২৫
- সাহাবীগণ (রাঃ) সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ—২৭
- আহলে বাইত সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ (ক) আহলে বাইত নিষ্পাপ ছিলেন কি ?—২৮ (খ) আহলে বাইত কারা ?—৩১ (গ) আহলে বাইত সম্পর্কে শীয়া আকীদার উদ্দেশ্য—৩৩ (ঘ) আহলে বাইতের প্রতি অতিভক্তির স্বরূপ—৩৩
- রসূল ও ইমাম সম্পর্কে শীয়া আকীদা ঃ (ক) ইমামের প্রতি বিশ্বাস রাখার গুরুত্ব—৩৭ (খ) রসূল ও ইমামের মধ্যে পার্থক্য নেই—৩৮ (গ) শীয়াদের ইমামগণের তালিকা—৩৯ (ঘ) ইমামদের উচ্চতর মর্যাদা—৪০ (ঙ) হযরত আলী (রাঃ) এর ইমামাত—৪১ (চ) হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এর ইমামাত—৪৪ (ছ) শীয়াদের অদৃশ্য ইমাম—৪৫
- শীয়া ফিক্‌হ শাস্ত্র ঃ (ক) ইসলামী ফিক্‌হ—৪৭ (খ) শীয়া ফিক্‌হের একটি মূলনীতি—৪৮ (গ) হানাফী ফিক্‌হ ও ইমাম জাফার সাদেক (রঃ)—৫০ (ঘ) শীয়া ফিক্‌হর আর একটি নীতি—৫১ (ঙ) শীয়া ফিক্‌হের উৎস—৫৩ (চ) শীয়া ফিক্‌হর নমুনা—৫৪ (ছ) মোতা বিয়ে—৫৭
- বেলায়াতে ফাকীহ ঃ —৬০
- শীয়া মতবাদে তাকিয়্যাহ নীতি ঃ (ক) তাকিয়্যাহ নীতির অর্থ—৬৪ (খ) শীয়া মতবাদে তাকিয়্যার গুরুত্ব—৬৪ (গ) তাকিয়্যাহ নীতির প্রয়োগ—৬৫ (ঘ) শীয়া তাকিয়্যাহ নীতির দলীল—৬৬ (ঙ) রাজনৈতিক তাকিয়্যাহ—৬৯ (চ) বেলায়াতে ফাকীহ্ ও তাকিয়্যাহ—৬৯
- শীয়াদের সম্পর্কে মনীষীবৃন্দের মন্তব্য ঃ —৭০
- শীয়া মতবাদ প্রচারের নিয়ম ঃ —৭১ (ক) শীয়া মতবাদ প্রচারের পন্থা—৭২ (খ) কর্মসূচী—৭৩ (গ) শীয়াদের ক্যাডার বা স্তর—৭৩

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইসলামের আকীদাগত বিষয়গুলো প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আকীদা শুদ্ধ ও সঠিক হওয়া ঈমানেরই দাবী। শির্ক কুফর ও নিফাক প্রথম মানুষের মন ও মগজে আকীদা হিসেবে প্রবেশ করে বদ্ধমূল হয়। তারপর তা তার কার্যকলাপের মাধ্যমে বাস্তব রূপ ধারণ করে। বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ হচ্ছে মন ও মগজে বদ্ধমূল আকীদা ও ধারণার বহিঃপ্রকাশ। আকীদা যেমন হয়, কাজও তেমন হয়। মন ও মগজে শির্ক, কুফর ও নিফাক ভিত্তিক আকীদা থাকলে বাস্তব কার্যকলাপে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম ও ইখলাস থাকতে পারে না। এই জন্যই তো আকীদার দ্বারা বাস্তব জীবন অবশ্যই প্রভাবান্বিত হয়। আল্লাহ, রসূল আখেরাত, কুরআন ইত্যাদির প্রতি ঈমান প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ আকীদাগত ব্যাপার। কাজেই আকীদার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতিকে অবহেলা করা যায় না। বিশেষ করে ইসলামের নামে রচিত ও প্রচারিত আকীদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য।

শীয়া মতবাদ ও শীয়া ধর্মমত ইসলামের নামেই পরিচিত। শীয়া সম্প্রদায়ও নিজেদেরকে মুসলিম বলেই দাবী করেন। এমতাবস্থায় শীয়া মতবাদ ও শীয়া ধর্মমতের আকীদা সমূহ সঠিকভাবে অবগত হওয়া এবং সকলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা দ্বীনী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ঈমানের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে এ বই খানা লিখিত হয়েছে।

এ বইতে শীয়াদের সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত আকীদা আলোচনা করা হয়নি। ইলমে কালামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও এতে পেশ করা হয়নি। শীয়াদের বহু দল ও উপদল রয়েছে। তার মধ্যে শুধু ১২ ইমাম পন্থি ইমামীয়া শীয়াদের প্রধান প্রধান আকীদা এতে নীতিগত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ইমামীয়া শীয়াদের প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাবিদদের এবং মুসলিম উম্মাতের বিশিষ্ট ও বিজ্ঞ মনীষীদের গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। নিছক হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা মূলক দৃষ্টিভংগী নিয়ে কারও বিরুদ্ধে কোন কথা লিখা হয়নি। অথবা অযৌক্তিকভাবে কোন কিছু এতে পেশ করা হয়নি। তবুও যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ গ্রন্থকারকে অবহিত করলে তা অবশ্যই বিবেচনা করে সংশোধন করা হবে। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

"হে আমাদের রব, তুমি আমাদের কাজ কবুল কর। তুমিই সব কিছু শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد الله رب العالمين و الصلوة و السلام على محمد و على اله
و اهل بيته و عترته و اصحابه اجمعين -

শীয়া মতবাদের ঐতিহাসিক পটভূমি

সূচনা

শীয়াদের দীর্ঘ ইতিহাস এখানে পেশ করা উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে বহু বড় বড় গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে আল্লামা আবুল ফাতহে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল কারীম শাহ্‌রেস্তানী (রঃ) এর الملل والنحل (আল মিলাল ওয়ান নিহাল), আল্লামা ইবনে খাল্লাদুনের (রঃ) মুকাদ্দামা, আল্লামা আবদুল কাহের (রঃ)-এর الفرق بين الفرق (আলফারকু বাইনাল ফিরাক), আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর منهاج السنة (মিনহাজুস সুন্নাহ), আল্লামা যাহাবী (রঃ)-এর المنتقى (আলমুনতাকা), আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ)-এর البداية و النهاية (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া), হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ)-এর تحفه اثنا عشريه اردو (তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া উর্দু) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা পেশ করা হল।

প্রথমেই একথা স্মরণ রাখা দরকার যে নবী (সঃ)-এর সময় যে মুনাফিক গোষ্ঠি মুসলিম উম্মাতের মধ্যে ছিল তারা তাঁর পরে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার সুযোগের সন্ধানে ছিল। ইয়াহুদীরাও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে মুনাফিকদের সহায়তায় গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তারপর ইরানী অগ্নি-পূজকরা এদের সাথে মিশে যে চক্রান্ত শুরু করল, তারই ফলে জন্ম লাভ করেছে শীয়া আন্দোলন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রমশঃ শীয়া মতবাদ পরিপূর্ণ রূপ ধারন করেছে।

শীয়াদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হিজরী ৩৫ সালে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যে দ্বন্দ হয়েছিল তারই সুযোগ গ্রহণ করে ইয়াহুদীরা মুনাফিকদের সাহায্যে মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করার চক্রান্ত করল। হযরত

www.pathagar.com

আলী (রাঃ) এর প্রতি মুসলিম উম্মাতের বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস চালাল। তাই তারা আলী (রাঃ)-এর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদেরকে হযরত আলী (রাঃ) এর শীয়া বা গ্রুপ বলে ঘোষণা করল। 'শীয়া' শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রুপ। পরবর্তী যুগে এ গ্রুপটি 'শীয়া' নামে পরিচিত হয়েছে এবং 'শীয়া মতবাদ' নামে একটি ধর্মমত রচিত হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সাথীরা হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নানা প্রকার অলৌকিক কথা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে খোদা বলেও প্রচার করতে লাগল। তারা বলতে লাগল যে, রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবার দুনিয়ায় আল্লাহর ছায়া এবং তাঁরা নিষ্পাপ ও ত্রুটিহীন। তারা আরও বলতে লাগল যে আল্লাহর সমস্ত হিকমাত ও জ্ঞান তাদেরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং তার মধ্যে আল্লাহর অংশ রয়েছে। কাজেই তাঁর উপর দিয়ে কারও কোন নেতৃত্ব চলতে পারে না এবং তিনিই ইমামতের একমাত্র হকদার। হযরত আলী (রাঃ) এসব প্রচার প্রপাগান্ডার খবর পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সাথীদেরকে তওবা করতে বাধ্য করেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে সাবাকে মাদায়েন দেশে বিতাড়িত করলেন। কিন্তু তারা গোপনে তাদের কাজ করতে লাগল। হযরত আলী (রাঃ) খিলাফাতের গুরু দায়িত্ব পালনে ও নানা প্রকার দ্বন্দ ও সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকায় তাদেরকে নির্মূল করার সুযোগ পাননি।

হযরত আলী (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর তারা আবার প্রকাশ্যে ব্যাপক ভাবে কাজ করতে লাগল। হযরত হুসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের পর এদের সাথে বহু ইরানীও যোগ দিল। তাদের আকীদা ছিল যে হযরত আলী (রাঃ) ইমামাতের একমাত্র হকদার হিসেবে ইমাম নিযুক্ত ছিলেন। তাদের মতে হযরত আলী (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি মেঘের সাথে থাকেন। মেঘের গর্জন তাঁরই আওয়াজ এবং বিদ্যুৎ তাঁরই হাসি। আর তিনি দুনিয়ায় ফিরে এসে সব অন্যায় অত্যাচার দূর করে দেবেন।

এরপর তারা হযরত আলী (রাঃ) এর খাদেম কাইসান ও তার সাথীদের সম্পর্কেও নানা প্রকার অলৌকিক ধ্যান ধারণা প্রচার করতে লাগল। এসব প্রচার প্রপাগান্ডার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্ম হল। এ সময় বাতেনিয়া রাযেমিয়া, মুখতারিয়া, হাশেমিয়া, বায়ানিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শীয়া আন্দোলন শুরু হল।

১২৯ হিজরীতে আবু মুসলিম খোরাসানী, ১৮৭ হিজরীতে বারমাকী সম্প্রদায় এবং ২৫৯ হিজরী পর্যন্ত তাহেরিয়া প্রশাসন উল্লেখিত আন্দোলনের

www.pathagar.com

ফল। তারপর কারামাতা, বুইহিউন ও আবিদিউন সম্প্রদায়ের জন্ম হল। এরা সবাই শীয়া আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল। তারপর ৫৬৮ হিজরীতে সুলতান সালাহুদ্দীনের পর এ আন্দোলন নূতন নামে আত্মপ্রকাশ করল। এসময় সফবিয়া, বাহাইয়া, দরুযিয়া, নোসাইরিয়া, ইসমাঈলিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শীয়া আন্দোলন চলতে লাগল।

শীয়া মতবাদ

এভাবে শীয়াদের ধর্মমত একটি বিশেষ মতবাদের রূপ ধারণ করল। তারা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রাঃ)-কে ইমামাতের হকদার বলে আকীদা রাখেন এবং তাদের অধিকাংশ লোকেরা ইমামিয়া শীয়া নামে পরিচিত। তারা তাদের ১২ জন ইমামকে আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন। হযরত জাফর সাদেক (রঃ) এর মাযহাব অনুযায়ী চলার দাবীও তারা করেন।

শীয়া পণ্ডিত হাসান ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী ইবনে মোতাহার আল হাল্লী (৬৪৮ হিঃ—৭২৬ হিঃ) মিনহাজুল কারামাহ্ নামক গ্রন্থ লিখে শীয়া মতবাদকে কুরআন ও হাদীসের অদ্ভুত ব্যাখ্যার মাধ্যমে সঠিক ও সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। সে সময় শীয়ারা তাতারীদের সাথে মিশে মুসলিম উম্মাতের ধ্বংস সাধনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রাষ্ট্রীয় অনুকূল্যে শীয়া মতবাদ

ইবনে মোতাহার ইল্‌খানী রাজা যায়েতুর (৬৭০—৭১৬ হিঃ) নামে উক্ত বই লিখেছিলেন। উক্ত রাজাকে তিনি খোদাবান্দা বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ রাজা ছিলেন চেঙ্গীজ খাঁ ও হালাকু খাঁর বংশধর। তিনি শীয়াদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। আল্লামা যাহাবীর (রঃ) লিখিত المنتقى গ্রন্থের টিকাতে আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন আলখতীব রাজা যায়েতুও ইবনে মোতাহার সম্পর্কে এক বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সেটা এই যে একবার উক্ত রাজা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাকে ফিরে পেতে চাইলেন। কিন্তু ফকীহ্‌গণ বললেন যে, স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে না করা পর্যন্ত তাকে ফিরে পাওয়ার কোন উপায় নেই। রাজা এ বিধান মানতে রাজী না হওয়ায় ইবনে মোতাহারের নিকট ফাত্‌ওয়া চাইলেন। তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, দুজন সাক্ষীর সামনে এ তালাক দেয়া হয়েছে কিনা। দুজন সাক্ষীর সামনে রাজা তালাক দেননি বলে জানালে ইবনে মোতাহার বললেন যে এ তালাকের শর্ত পূরণ হয়নি।

www.pathagar.com

কাজেই তালাক হয়নি এবং পূর্বের মতই স্ত্রীকে নিয়ে জীবন যাপন করা যেতে পারে। রাজা এতে খুব খুশী হলেন এবং ইবনে মোতাহারকে তার নিজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন। তার পরামর্শে রাজা দেশের সমস্ত মাসজিদে শীয়াদের বার ইমামের নামে খুত্‌বা পাঠ করার হুকুম দিলেন। দেশের মুদ্রায় তাদের নাম অংকিত করা হল এবং সব মাসজিদের দেয়ালে তাদের নাম অংকন করার হুকুম দেয়া হল। এভাবে ইবনে মোতাহারের ভ্রান্ত ফাত্‌ওয়ার বরকতে শীয়া মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র চলতে লাগল। হিঃ ৭ ৭ সালে খোরাসান ও ইরানে সরকারীভাবে শীয়া মতবাদ এভাবে সর্বপ্রথম চালু হল। এর তিনশত বছর পরে সফবীয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে দ্বিতীয় বার ইরানে সরকারীভাবে শীয়া মতবাদ পূর্ণভাবে চালু হল।

শীয়াদের বিভিন্ন ফেরকা

আল্লামা আবদুল কাহের বাগদাদী (রঃ) তার الفرق بين الفرق গ্রন্থে লিখেছেন যে, শীয়াদের ২০টি সম্প্রদায় রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি ইমামীয়া শীয়া সম্প্রদায় তিনটি যায়দীয়া সম্প্রদায় এবং ২টি কাইসানীয়া সম্প্রদায়। ইমামীয়া শীয়াদের ১৫টি সম্প্রদায় নিম্নরূপ ঃ

মুহাম্মাদীয়া, বাকেরীয়া, নাবুসীয়া, শামায়তীয়া, আম্মারীয়া, ইসমাঈলীয়া, মুবারাকীয়া, মুসুবীয়া, কাত্‌ইয়া, ইসনা আশারীয়া, হিশামীয়া, যারারীয়া, ইউনুসীয়া, শায়তানীয়া ও কামেলীয়া।

যায়দীয়া শীয়ার তিন সম্প্রদায় নিম্নরূপ ঃ জারুদীয়া, সুলাইমানীয়া ও বুত্‌রীয়া। এরা সবই যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের দাবীদার। তবে এরা উগ্রপন্থী নয়, বরং নরমপন্থী। মুসলীম উম্মাতের সাথে এদের বিরোধ থাকলেও এরা আপোষহীন নয়। অবশ্য এদের তেমন কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। বর্তমান ইরানের শাসনতন্ত্রে হানাফী, শাফেয়ী হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের সাথে এদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে। যায়দীয়াও তিন দলে বিভক্ত ঃ জারুদীয়া, সুলাইমানীয়া ও বুত্‌রীয়া। এর মধ্যে বুতরীয়া সম্প্রদায় মুসলীম উম্মাতের নিকটবর্তি হলেও শীয়া মতবাদেরই সমর্থক।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) তাঁর تحفة اثنا عشريه তোহফায়ে ইস্‌না আশারিয়া গ্রন্থে চরম পন্থী শীয়াদের ২৪টি সম্প্রদায় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি কাইসানিয়া শীয়াদের ৬টি যায়দিয়াদের ৯টি

www.pathagar.com

এবং ইমামিয়া শীয়াদের ৩৯টি সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন। এ হিসাব অনুযায়ী শীয়াদের মোট ৭৮টি সম্প্রদায় হয়েছে।

সকলের বর্ণনাতেই ইমামীয়া শীয়াদের একটি সম্প্রদায় হচ্ছে ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া (امامية । اثنا عشرية)। অর্থাৎ ১২ ইমাম পন্থী ইমামিয়া। এ বইতে যেহেতু শুধু এই সম্প্রদায়ের আকীদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তাই এদের ইতিহাস পৃথকভাবে পেশ করা হল।

ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া

এ সম্প্রদায় প্রথমে ইরাকের আশেপাশে বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিল। এরা নিজেদেরকে বাহ্যতঃ "আহলে সুন্নাত" এর অন্তর্ভুক্ত বলে প্রকাশ করতেন এবং তাকিয়্যাহ বা কপটতা অবলম্বন করে দূরে দূরে থাকতেন। তারপর ৩২১ হিজরীতে এদের নেতা ইমাদুদ্দৌলা ইরাকের বাদশাহ হলেন। এর রাজত্ব পারস্য ও দায়লামেও মযবুত হয়ে গেল। এই সময়ে সমস্ত ইসনা আশারিয়া পন্থীরা সব স্থান থেকে ইমাদুদ্দৌলার রাজ্যের বিভিন্ন শহরে এসে বসবাস করতে লাগলেন। এভাবে আযার বাইজান, খোরাসান, জুরজান, মাযেন্দারান, জীলান ইত্যাদি দেশসমূহ পর্যন্ত এ সম্প্রদায়ের শীয়া মতবাদ শক্তিশালী হয়ে উঠল।

এ সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু পন্ডিত ব্যক্তির জন্ম হয়েছে। তারা বই লিখে লিখে শীয়া ধর্ম মত প্রচার করেছেন। কিন্তু এরূপ শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করা সত্বেও এ সম্প্রদায় তাদের তাকিয়্যাহ নীতি (কপটতা) ত্যাগ করেনি। এমনকি তাদের প্রধান মন্ত্রী "সাহেবে ইবাদ"ও (صاحب عباد) নিজেকে মুতাযিলা সম্প্রদায় ভুক্ত বলে প্রকাশ করতেন। অথচ পর্দার অন্তরালে তিনি ছিলেন একজন কঠোর ও পাক্কা শীয়া।

দায়লাম রাজত্বের অবসানের সময় ইসনা আশারিয়াগণ তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে মু'তাযিলা ও আহলে সুন্নাতের সাথে মিলে একাকার হয়ে গেল। তারপর তাতারীদের ধ্বংসাত্বক ঘটনা ঘটল। এ সময় তাতারী উযীর নাসীরুদ্দীন তূসীর সাথে তার ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপে শীয়ারা পূর্ণ সহযোগীতা করেছেন। এরপর রাজা জায়েতু খোদা বান্দার (৬৭০ হিঃ—৭১৬ হিঃ) রাজত্বকালে ইসনা আশারিয়াদের বিখ্যাত পন্ডিত ইবনে মোতাহার হাল্লি ও তাজুদ্দীন উক্ত রাজার মাধ্যমে শীয়া মতবাদকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ সময় এ সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। উক্ত রাজার মৃত্যুর পর এ সম্প্রদায় বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মগোপণ করল। তারপর [illegible]

www.pathagar.com

এরাও ছিল ইস্না আশারিয়া শীয়া। এ সময় সমস্ত শীয়া আবার একত্রিত হয়ে তাদের কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু তারাকোমা রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে শীয়াদের শক্তিও খতম হয়ে গেল। তারপর ৯১০ খৃষ্টাব্দে হায়দারী বাদশাহরা তারাকোমাদের রাজ্য দখল করে নিলে ইসনা আশারিয়া শীয়ারা আবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেল। এ সময় তারা বাদশাহকে ইমাম মেহদীর নায়েব আখ্যা দিয়ে তাকে সাজ্দা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করার ব্যবস্থা করলেন। তারা বাদশাহের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর বিরোধীদেরকে হত্যা করার বন্দোবস্ত করলেন এবং জুমুয়ার নামায থেকে মুসলিমদেরকে বাধাদানের ব্যবস্থা করলেন। মাসজিদের ইমামদের উপর ফরমান জারী করা হল যে, তারা যেন সাহাবা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) কে প্রকাশ্যে গালী দেন। শীয়া মুজাবেদ্ব তাদের উপর লানত করা ওয়াজিব বলে ফাত্ওয়া দিলেন। বাদশাহ তার কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে আন্তরিকতা সহকারে মেনে নিতেন। আহলে সুন্নাতের একদল আলেমকে তার নির্দেশে হত্যা করা হয়। মুসলিম উম্মাতের কাযী হামাদানী (রঃ) ও কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রঃ) এর মৃতদেহের অসম্মান করা হয়। এমন কি তাদের হাড় কবর থেকে উঠিয়ে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম উম্মাতের জন্য এটা একটা কঠিন সময় ছিল।

এ সময় তুরানের বাদশাহ উবায়দুল্লাহ খান মাযলুমদেরকে উদ্ধার করার জন্য খোরাসান দখল করে নিয়ে যালিমদেরকে খতম করে দেন। উক্ত বাদশাহের ইন্তেকালের পর বুখারা, বাল্খ্ ও খাওয়ারিযম্ আমীরগণ এবং রোম সম্রাটের সাথে এই শীয়া সম্প্রদায়ের চরম সংঘর্ষ চলে। অবশেষে অফগানীদের দ্বারা তারা পরাভূত হয়।

এই সময়েই ইস্না আশারিয়া শীয়ারা বিভিন্ন স্থান থেকে পালিয়ে তদানিন্তন ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিলেন। এদেশে এসে তারা আবার সংঘবদ্ধ হলেন। তারপর ধীরে ধীরে এদেশের বাদশাহ, আমীর ও ব্যবসায়ীদের সাথে মিলে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে নিলেন। এভাবে তাদের ধর্মমত প্রচার ও প্রসারের কাজ আবার নুতন উদ্যোমে শুরু হল। অবশেষে তারা মোগল রাজত্বের আমলে ভারতবর্ষের উযীর, আমীর ও সুবেদার হওয়ারও সুযোগ পেলেন। এভাবে এ উপমহাদেশের অধিকাংশ শহরে ইরাক ও খোরাসানের মত তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার লাভ করল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এই শীয়া সম্প্রদায় বাংলাদেশে এসে এখানে তাদের মতবাদ ও ধর্মমত প্রচার করতে লাগলেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন থেকে নিয়ে শাহজাহান পর্যন্ত সকল সম্রাটই শীয়াদের দ্বারা কম বেশী

www.pathagar.com

প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিশেষ করে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী নূরজাহান ও তার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে শীয়া মতবাদ দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত ছিলেন। আর এ কারণেইতো হযরত শায়খ আহমাদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরোধীতা করেন। তখন শীয়ারা এ উপমহাদেশের হিন্দুদের সাথে মিশে মুসলিম সম্রাটদেরকে নিজেদের ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশেও তারা একই ভূমিকা পালন করেন।

এখানে শীয়াদের যে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় পেশ করা হল, তা থেকে একথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, শীয়া মতবাদ খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) যুগ পর্যন্ত ছিল না। যদিও ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আলী (রাঃ) এর খিলাফাতের আমলে শীয়াদের আদি ও প্রথম গুরু হিসেবে এ মতবাদ রচনার কাজ শুরু করে, কিন্তু তা পূর্ণ রূপ ধারণ করে অনেক পরে। আর এ মতবাদ বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং উত্থান ও পতন পার হয়ে শীয়াদের বহু সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। এ কথাটা জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী তাঁর الحكومة الاسلامية গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় এরূপভাবে লিখেছেন ঃ

"শীয়া মাযহাব শূন্য থেকে শুরু হয়েছে।..... আর শীয়াদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ ২০০ মিলিয়ন বা ২০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।"

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী দুনিয়ার সমস্ত প্রকার শীয়াদের সংখ্যা ২০ কোটি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর উক্ত গ্রন্থ ১৩৮৯ হিঃ সালে লিখিত হয়েছে। কাজেই বর্তমানে শীয়াদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। জনাব খোমেনীর উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি শীয়া হিসেবে সব শীয়া ফেরকাকে একই শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন এবং ইসনা আশারিয়া শীয়াদেরকে অন্যান্য শীয়াদের থেকে পৃথক গণ্য করেননি।

শীয়া মতবাদের মূল ভিত্তি

বুদ্ধি ও শারীয়াত ঃ

শীয়া মতবাদের উল্লেখিত ঐতিহাসিক পটভূমির পর তার মূল ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। মুসলিম উম্মাতের নিকট সমস্ত প্রকার আকীদার মূল ও প্রথম ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সুন্নাত। কিন্তু শীয়া আকীদা সমূহের মূল ও প্রথম ভিত্তি হচ্ছে

www.pathagar.com

মানবীয় বুদ্ধি। এজন্য শীয়া মতবাদের বহু আকীদা মুসলিম উম্মাতের মৌলিক ইসলামী আকীদা থেকে স্বতন্ত্র।

শীয়াদের মতে যে কোন আকীদার ব্যাপারে প্রথমতঃ মানবীয় বুদ্ধির ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষনা করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। তারপর শারীয়াতের দলীল বিবেচনার যোগ্য। তাদের মতে যে কোন আকীদা সম্পর্কে প্রথমে দেখতে হবে যে, সে ব্যাপারে বুদ্ধির দাবী কি? এরপর তার প্রতি শারীয়াতের সমর্থন সঠিক বলে গণ্য হয়। অন্য কথায় শীয়াদের মতে ইসলাম হচ্ছে প্রথমতঃ বুদ্ধি ভিত্তিক। তারপর তা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত। তাদের মতে শুধু কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা কোন বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

এ সম্পর্কে নাজাফের শীয়া মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফার তার عقائد الامامية (আকায়েদুল ইমামিয়া) গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

و بالاختصار عندنا هنا ادعاءان ؛

(الاول) وجوب النظر و المعرفة فى اصل العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها -

(الثانى) ان هذا وجوب عقلى قبل أن يكون وجوبا شرعيا - أى لايستقى علمه من النصوص الدينية وان كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل -

"এখানে সংক্ষেপে আমাদের দু'টি দাবী রয়েছে ঃ

(১) আকীদার মূল নীতির ব্যাপারে গবেষণা করা ও অবগত হওয়ার অপরিহার্যতা। আর এ সম্পর্কে অপরের অনুসরণ করা জায়েয নয়।

(২) এ অপরিহার্যতা শারিয়াত ভিত্তিক হওয়ার পূর্বে বুদ্ধিভিত্তিক। অর্থাৎ কারও জ্ঞান দ্বীনী দলীল সমূহ দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়না; যদিও এটা ঠিক যে বুদ্ধির দ্বারা বুঝার পর তা তার সমর্থক হয়।"

(আকায়েদুল ইমামিয়া ৩২ পৃষ্ঠা, ১৩৮০ হিজরীতে প্রকাশিত)

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে আকীদার ব্যাপারে প্রথমেই মানবীয় বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে হবে। তারপর শারীয়াতের দলীল তার সমর্থনে গ্রহণ করা যেতে পারে। অতএব শারীয়াতের দলীল মানবীয় বুদ্ধির পরে প্রযোজ্য। কাজেই শীয়া মতবাদের প্রথম ও মূল ভিত্তি হচ্ছে মানবীয় বুদ্ধি।

www.pathagar.com

এ জন্যই শীয়া মতবাদে ভাল ও মন্দের ধারণা এবং ইসলামের আদেশ ও নিষেধ বুদ্ধির ভিত্তিতে গৃহীত। কোন্ কাজ ভাল এবং কোন্ কাজ মন্দ তার প্রথম ফায়সালা এ মতবাদে ইসলামী শারীয়াতের ভিত্তিতে নয়, বরং মানবীয় বুদ্ধির ভিত্তিতে হয়। এক্ষেত্রে শীয়া মতবাদ মুতাযিলা মতবাদের অনুরূপ। এ সম্পর্কে কাইরো ভাষা শিক্ষা কলেজের আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ হামেদ হাফানী দাউদ আকায়েদুল ইমামিয়া গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

فهما فی نظر الشیعة بعامة والامامیة بخاصة جوهریان ذاتیان فی الاشیاء ولیس انیین من قبل امر الله ونهیه ... ...

وان رأیهم فی الحسن والقبح الذاتیین هوراثی جعها بذة المعتزلة ... ...

وان الاعتزال ولد ودرج فی احضان التشیع - (مقدمة عقائد الامامیة - صفحه ۱۹)

“এ দুটি (ভাল ও মন্দ) সাধারণ ভাবে সমস্ত শীয়া এবং বিশেষ করে ইমামিয়া শীয়াদের দৃষ্টিতে বস্তুর মূল অস্তিত্বের মধ্যে নিহিত। এ দুটি আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ থেকে আসে না। ... ... আর ভাল ও মন্দের ব্যাপারটা তাদের মতে যে অস্তিত্বগত সেটাই বিশিষ্ট মু'তাযিলাগণেরও মত। ...... আর মু'তাযিলা মতবাদটা শীয়া মতবাদের ক্রোড়ে জন্ম লাভ করে লালিত পালিত হয়েছে।” (আকায়েদুল ইমামিয়া গ্রন্থের ভূমিকা পৃষ্ঠা—১৯)।

এ উদ্ধৃতিতে ভাল ও মন্দের ব্যাপারটা অস্তিত্বগত হওয়ার অর্থ এই যে মানবীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই জানতে হবে যে কোনটা অস্তিত্বগত ভাবে ভাল এবং কোনটা অস্তিত্বগত ভাবে মন্দ। কারণ আদেশ ও নিষেধ থেকে যে ভাল মন্দ আসেনা সে কথা সুষ্ঠু ভাবে বলা হয়েছে। আর মুতাযিলা মতবাদে বুদ্ধিমত্তার দ্বারাই ভাল ও মন্দের ব্যাপারটা ফায়সালা করা হয়েছে এবং মু'তাযিলা মতবাদও যে শীয়া মতবাদের সন্তান তাও এখানে বলে দেয়া হয়েছে।

ভাল ও মন্দের ব্যাপারে শীয়া মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফার عقائد الامامية গ্রন্থে আরও লিখেছেন ঃ

ونقول ایضا انه من القبیح ان یأمر بما فیه المفسدة أو ینهی عما فیه المصلحة غیر ان بعض الفرق من المسلمین

www.pathagar.com

يقولون : ان القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما امر به فليس في نفس الافعال مصالح او مفاسد ذاتية ولا حسن او قبح ذاتيان - وهذا قول مخالف للضرورة العقلية - (عقائد الامامية صفحه ٧٤)

"আমরা আরও বলছি যে মন্দ হচ্ছে এমন কাজের আদেশ দেয়া যার মধ্যে অকল্যাণ (مفسدة) রয়েছে অথবা এমন কাজ নিষেধ করা যার মধ্যে কল্যান (مصلحة) রয়েছে। তবে মুসালম জাতির কোন এক দল বলে : 'মন্দ কাজ সেটাই যেটা আল্লাহ নিষেধ করেছেন; আর সেটাই ভাল কাজ যার আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন।' কাজেই (তাদের মতে) কাজের মধ্যে কোন অস্তিত্বগত কল্যাণ অথবা অকল্যাণ নেই এবং ভাল অথবা মন্দ অস্তিত্বগতও নয়। আর এ কথাটা বুদ্ধিগত প্রয়োজনের বিরোধী।"

(আকায়েদুল ইমামিয়া ৪৭ পৃষ্ঠা)

এ উদ্ধৃতিতে মুসলিম জাতির কোন এক দলের যে মত উল্লেখ করা হয়েছে তাই গোটা মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে মুসলিম উম্মাহ চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের বিরোধী। গোটা মুসলিম উম্মাতের অসংখ্য বিজ্ঞ মনীষীবৃন্দ চিন্তা, গবেষনা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে অসাধারণ ও অতুলনীয় বুদ্ধিমতা প্রয়োগের পরিচয় ও প্রমান দিয়েছেন তা সারা জগতে চির স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু ভাল ও মন্দ নির্ণয়ে এবং ইসলামী শারীয়াতের বিধান প্রনয়নে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং উক্ত দুটি দলীলকেই ভিত্তি ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। মানবীয় বুদ্ধিমত্তাকে তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতের সমমর্যাদাও দেননি। এটাই ইসলামের সঠিক নীতি। এভাবে শীয়া মতবাদ ও ইসলামের মধ্যে বহু বিষয়ে আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে। তাই এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে কতিপয় শীয়া আকীদা আলোচনা করা হল।

আল্লাহ সম্পর্কে শীয়া আকীদা

আল্লাহর আকার ও শরীর

ইমামিয়া শীয়াদের হাকামিয়া, সালেমিয়া, শায়তানিয়া ও যায়সামিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা এই যে আল্লাহর শরীর আছে। শীয়া মুহাদ্দিস কোলাইনী এ ব্যাপারে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ হামাদানী থেকে বর্ণনা করেছেন :

www.pathagar.com

قد اختلفوا فى التوحيد فمنهم من يقول جسم و منهم من يقول صورة -

"তারা তাওহীদের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। কেউ বলে যে আল্লাহর শরীর আছে, আর অন্য কেউ বলে যে তার আকার আছে।"

কোলাইনী এ সম্পর্কে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খাযার ও মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

دخلنا على ابى الحسن الرضا وقلنا ان هشام بن سالم وصاحب الطاق والميثمى يقولون إنه تعالى أجوف الى السرة والباقى صمد فخر لله ساجدا ثم قال سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم إن شبهوك بغيرك اللهم لا اصفك الا بما وصفت به نفسك ولا اشبهك بخلقك انت اهل لكل خير فلا تجعلنى مع القوم الظالمين -

"আমরা আবুল হাসান রিযা (রঃ) এর নিকট গিয়ে বললাম যে হিশাম ইবনে সালেম, সাহেবে তাক্ওমায়সামী বলেনঃ 'আল্লাহ তায়ালার নাভী পর্যন্ত ফাঁপা এবং বাকী দেহ ঘন ও শক্ত।' আবুল হাসান এতে আল্লাহর সামনে সাজদায় পড়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তুমি পবিত্র। তারা তাদের নাফ্স বা কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য করেছে। তোমাকে তারা অপরের সাথে মিশিয়েছে। হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সেই সব গুণে গুণান্বিত করছি যা দ্বারা তুমি তোমার নিজেকে গুণান্বিত করেছ। আর আমি তোমাকে তোমার সৃষ্টের সাথে মিশাইনা। তুমি প্রত্যেক কল্যাণের মালিক। তুমি আমাকে যালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।"

কোলাইনী হাসান ইবনে আব্দুর রহমান হামালী থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি আবুল হাসান কাযেম (রঃ)-কে বলেছেন ঃ "হিশাম ইবনে হাকাম মনে করে যে আল্লাহর শরীর আছে।" এ কথার উত্তরে হাসান কাযেম বললেন "আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন।"

ইস্না আশারিয়াদের অভিমত ঃ

শীয়া ইমামিয়া ইসনা আশারিয়া নিজেদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখিত আকীদার বিরোধী বলে প্রকাশ করেন। কিন্তু যে সব ব্যক্তিগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করেছেন তাদের নিকট থেকে শীয়া ইস্না আশারিয়া সম্প্রদায় হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাদেরকে বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিস রূপে গণ্য

www.pathagar.com

করেছেন। হিশাম ইবনে সালেম, হিশাম ইবনে হাকাম, সাহেবে তাক্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইমামিয়া ইসনা আশারিয়াদেরই বিশিষ্ট আলেম ও মুহাদ্দিস। অথচ তাদেরই ইমাম এদেরকে যালিম বলেছেন এবং বদ দোয়া করেছেন। কিন্তু তবুও ইসনা আশারিয়া শীয়াগণ ঐসব ব্যক্তিগণকে নিজেদের আলেম ও মুহাদ্দিস বলে গ্রহণ করেছেন। কাজেই ইস্না আশারিয়াগণ আল্লাহ সম্পর্কে উল্লেখিত আকীদা না রাখলেও পরোক্ষভাবে এ আকীদার প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে বলে মন্তব্য করার অবকাশ অগ্রাহ্য করা যায় না।

এ সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) তোহফায়ে ইসনা আশারিয়া গ্রন্থের ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

اور دوسری گزارش اثنا عشری حضرات سے یہ ہے کہ جب حضرات ائمہ نے اس جماعت کی تکذیب فرمائی اور اس شدومد سے اور اس حد تک برائی فرمائی کہ الکے لئے قاتلہ اللہ ، اخزاہ اللہ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور واستعذ باللہ من الشیطان جیسے سخت الفاظ استعمال فرمائے تو پھر ایسے رسواو ذلیل لوگون ہی کی روایات دین و ایمان کے بارے مین لا نا اور ان روایات پر اعتماد کرلینا اخر اسکو کیا سمجھا جائے ؟ معمولی سے معمولی ذہن کا آدمی یہی کہیگا کہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور یہ حقیقت سے بعید بھی نہیں ۔

"ইস্না আশারিয়া শীয়াগণের নিকট দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, শ্রদ্ধেয় ইমামগণ এ দলকে (উল্লেখিত শীয়া আলেম ও মুহাদ্দিস) মিথ্যাবাদী বলে মন্তব্য করেছেন এবং কঠোরভাবে তাদের দোষ বর্ণনা করেছেন। এমন কি তাদের সম্পর্কে কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ "আল্লাহ ধ্বংস করুন," "আল্লাহ অপমানিত করুন," "হে আল্লাহ আমাকে যালিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করোনা" "শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।" তাহলে এ হেন নীচু ও দোষী লোকদের বর্ণিত হাদীস সমূহকে দ্বীন ও ঈমান সম্পর্কে পেশ করা এবং এসব হাদীসকে বিশ্বাস করার দ্বারা কি বুঝা যায় ? অতি সাধারণ বুদ্ধিমান লোকও এ কথাই বলবে যে সব একই দলের অর্ন্তভুক্ত। আর এ মন্তব্য সত্য থেকে দূরেও নয়।"

www.pathagar.com

কুরআন সম্পর্কে শীয়া আকীদা

শীয়াদের কুরআন ঃ

কুরআন সম্পর্কে শীয়াদের যে আকীদা ও ধারণা তাদেরই গৃহীত হাদীসে পাওয়া যায় তাই এখানে পেশ করা হল। তাদের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ 'আলকাফী' ১ম খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠায় কুরআন সম্পর্কে লিখিত আছে ঃ

عن ابى بصير رضى الله عنه قال قال ابو عبد الله أى جعفر الصادق و ان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام - قال قلت وما مصحف فاطمة ؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات - و الله ما فيه من قرآنكم حرف واحد -

الكافى صفحه ١/٢٣٩ طهران دار الكتب الاسلامية

আবূ বাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ অর্থাৎ জাফার সাদেক বলেছেন ঃ "আমাদের নিকট ফাতেমা (রাঃ) এর মাস্‌হাফ (কুরআন শরীফ) রয়েছে।" তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, ফাতেমার মাস্‌হাফ আবার কি ? তিনি বললেন ঃ "সেটা এমন মাস্‌হাফ (কুরআন) যে তাতে তোমাদের এই কুরআনের তিনগুণ বেশী রয়েছে। আল্লাহর শপথ, তাতে তোমাদের কুরআনের একটি অক্ষরও নেই।"

(আল কাফী—পৃষ্ঠা ঃ ২৩৯/১)

এই মনগড়া হাদীসে কুরআন সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) এর যে উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অসত্য। মুসলিম উম্মাতের শ্রদ্ধাভাজন এই মহাপুরুষ কুরআন সম্পর্কে কখনও এরূপ কথা বলেননি এবং তিনি এরূপ কথা বলেছেন বলে কোন বিশ্বস্ত প্রমাণও নেই। এটা তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি শীয়াদের নিষ্পাপ বার ইমামগণের একজন এবং তাঁরই মাযহাব ইরানের সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। অথচ শীয়াগণ আজ পর্যন্ত তাদের হাদীসের মহাগ্রন্থ আল কাফীতে বর্ণিত এই মনগড়া হাদীসের ব্যাপারে নীরব। এতে কুরআন সম্পর্কে তাদের মূল আকীদা উক্ত মনগড়া হাদীসের অনুরূপ বলে ধরে নেয়ার অবকাশ রয়েছে।

এ ব্যাপারে নাজাফের একজন শীয়া আলিম মির্জা হোসাইন ইবনে মুহাম্মাদ তাকী নূরী তাবারাসী একখানা বই লিখেছেন। তার নাম হচ্ছে "فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب" এ বইতে তিনি শীয়া আলিমদের শতাধিক বক্তব্য পেশ করে এ ধারনা ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেছেন যে কুরআনে পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বইটা ইরানে ১২৮৯ হিজরীতে ছাপা হয়েছে। এটা কুয়েতে শীয়াদের সিহাফ মাসজিদের লাইব্রেরীতে আছে এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে এর ফটো কপি রক্ষিত আছে।

এর গ্রন্থকার জনাব নূরী তাবরাসী শীয়াদের মতে খুবই বিশ্বস্ত মহা পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। তাদের নিকট তিনি অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও ভক্তি ভাজন মহা পুরুষ। তার লিখিত কিতাব শীয়াদের নিকট নিঃসন্দেহে বিশ্বস্ত গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত ও গৃহীত। তাই তার আলোচ্য গ্রন্থের সূচীপত্র ও ভূমিকার ফটোকপি এ বই এর ১৫, ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠায় পেশ করা হল। তাছাড়া এ গ্রন্থের ১৮০ ও ১৯১ পৃষ্ঠায় سورة الولاية (সূরা বেলায়াত) নামক একটি সূরাও রয়েছে। এ সূরাটিকে হযরত উসমান (রাঃ) মূল কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বই এর ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় তারও ফটো কপি পেশ করা হল। শীয়া পণ্ডিত নূরী তাবরাসী উক্ত সূরাটিকে শীয়াদের একটি বিশ্বস্ত গ্রন্থ "دبستان المذاهب" থেকে তার গ্রন্থে লিখেছেন। এ মনগড়া সূরায় একমাত্র হযরত আলী (রাঃ) এর মর্যাদা ও তাঁর নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

জনাব নূরী তাবরাসী তার গ্রন্থে বর্তমান কুরআনের ৯৫টি সূরায় বিভিন্ন আয়াত ও শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা কুরআন বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে বলে শীয়ারা যে আকীদা পোষণ করেন তার একটি আকাট্য প্রমাণ হল জনাব নূরী তাবরাসীর গ্রন্থ "فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب"

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست ما في هذا الكتاب الشريف من المطالب اجمالاً

المقدمة الأولى

في ذكر الاخبار التي وردت في جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وكونه في معرض النقص بالنظر الى كيفية الجمع وان تاليفه يخالف تاليف المؤ

المقدمة الثانية

في بيان اقسام التغيير الممكن حصوله في القرآن والممتنع دخوله فيه

المقدمة الثالثة

في ذكر اقوال علمائنا في تغيير القرآن وعدمه

الباب الأول

في ذكر ما استدلوا به على وقوع التغيير والنقصان في القرآن

الدليل الأول مركب من امور وقوع التحريف في التورية والانجيل بطرز حسن لطيف وفي ان كلما وقع في الامم السالفة يقع في هذه الامة وفي ذكر موارد شبه فيها بعض هذه الامة بنظيره في الامم السالفة مما اوردناها في اخبار خاصة فيها دلالة على كون القرآن كالتورية والانجيل في وقوع التغيير فيه **الثاني** ان كيفية جمع القرآن مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه وفيه اجمال حال كتاب الوحي **الثالث** في ابطال وجود منسوخ التلاوة وان ما ذكروه مثالا له لا بد وان يكون مما نقص من القرآن **الرابع** فانه كان لامير المؤمنين عليه السلام قرآنا مخصوصا يخالف الموجود في الترتيب وفيه زيادة ليست من الاحاديث القدسية ولا من التفسير والتاويل **الخامس** انه كان لعبد الله بن مسعود مصحفا معتبرا فيه ما ليس في القرآن الموجود **السادس** ان الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف ابي المعتبر عندنا **السابع** ان عثمان لما جمع القرآن ثانيا اسقط بعض الكلمات والآيات وفيه كيفية جمعه وبعض ما اسقطه واختلاف مصاحفه وما اخطأ فيه الكتاب **الثامن** في اخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان زيادة على ما رواها المخالفون **التاسع** انه تعالى ذكر اسامي اوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة السالفة فلا بد ان يذكرها في كتابه المهيمن عليها وفيه ما وصل الينا من ذكرهم في الصحف الاولى مما لم يجمع في كتاب **العاشر** اثبات اختلاف القراء في الحروف والكلمات وغيرها وابطال تواترها على غير واحد وفيه شرح احوال القراء واثبات وجود المدلسين في اسانيدهم **الحادي عشر** في اخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان في القرآن عموما **الثاني عشر** في اخبار خاصة كثيرة رتبناها على ترتيب سور القرآن وفيه ذكر الجواب عن شبهات اوردوها على الاستدلال بها **الباب الثاني** في ذكر ادلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقا من الآيات والاخبار والاعتبارات والجواب عنها مفصلا وفيه ذكر وقوع التحريف في التورية ثانيا في عهد الرسول

www.pathagar.com

رب
الارباب
كتاب
في اثبات تحريف
يسمى بفصل الخطاب
هذا كتاب لطيف وسفر شريف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

الحمد لله الذي انزل على عبده كتابا جعله شفاء لما في الصدور ومهيمنا على التورية والانجيل والزبور
والصلوة والسلام على حامل نور النور والبيت الرفيع المعمور ومحل تدبير الامور وما للناس منه النشور
محمد المنتجب في عالم الذرور وادم صلصالا تهب عليه الشمال والدبور وعلى آله الصحف الناطقة بكل
غائب مستور والزبر المحتوية لما يكون ومضى في سالف الدهور مصابيح الانام في ظلمات عالم
الغرور ومفاتيح خزائن العلم المسطور في رق منشور خصوصا على مختلف الملائكة في الاصال والبكور
القطب الذي على مدار وجوده الافلاك تدور والمشرق نوره في قلوب مواليه المحجوب عن اعين كل عديم الشعور
الى يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور **وبعد** فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي
النوري الطبرسي جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه هذا كتاب لطيف وسفر شريف
عملته في اثبات تحريف القرآن وفضائح اهل الجور والعدوان وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب
رب الارباب وجعلت له ثلث مقدمات وبابين واودعت فيه من بدايع الحكمة ما تقر به كل عين وارجو
ممن ينتظر رحمة المسيئين ان ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون **المقدمة الاولى** في ذكر ما
جاء في جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وزمانه وكونه في معرض تطرق النقص والاختلاف بالنظر الى
كيفية الجمع مع قطع النظر عما يدل على تحققه وعدمه من الخارج وان تأليفه يخالف تأليف المؤلفين
وتصنيف المصنفين قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال تعالى انا انزلناه

في ليلة

www.pathagar.com

مدحهم الله به من قوله عز وجل ما زادهم ما كانوا فيه من الشدة الا ايمانا وتسليما من المؤمنين واما المنافقون
فما قص الله من خبرهم وحكى عن بعضهم قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم الى قوله وكان ذلك على الله يسيرا وقد
اجمعوا ان اول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك وليس تقرأ فيما القوا من المصحف الا قريبا من آخر ما فيه
من القرآن سورة البقرة وقد كتبوها في اول المصحف وروى بعض العلماء انه لما ظفر عمرو بن عبد ود الخندق من
لخره وقال رجل من المنافقين من قريش لبعض اخوانه ان قريشا لا يريدون الا محمدا فهلموا ناخذه فندفعه
الى ايديهم ونسلم نحن بانفسنا فاخبر جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وآله فتبسم وانزل الله عليه هذه الآية قد
يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا الآية انتهى والنسخة كانت سقيمة وقيد ذكر علي بن ابراهيم
وغيره لا خلاف لنا الى البقية شواهد كثيرة تقدم بعضها متفرقا وقد حان لنا ان نعطف عنان القلم الى حمد من
علم الانسان ما لم يعلم واودع في سوائر قلوبهم بدائع الحكم واجرى على لسانهم طرائف الكلم ونتوسل بالصلوة
على النبي الاكرم والفاتح الخاتم المبعوث على طوائف الامم وعلى آله اولياء النعم ومصابيح الظلم واسرار الجود
لآدم وقد فرغ من تنميق هذه الاوراق رجاء الانتفاع بها في يوم يكشف عن ساق العبد المذنب المسيء
المنسي حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في مشهد مولانا امير المؤمنين عليه السلام ليلتين بقيتا من شهر
جمادى الآخرة من سنة اثنين وتسعين بعد الالف والمائتين من
الهجرة النبوية على مهاجرها الاف سلام

[illegible]

وقد فرغ من تسويد هذا الكتاب العال بعون الله الملك المتعالي في ثاني عشر شهر شوال المكرم شهور سنة ثمان وتسعين و
مائتين بعد الالف من الهجرة المقدسة النبوية على مهاجرها الاف الثناء والتحية
وانا العبد العاصي الفاني ابن مرحوم ميرزا محمد رضا احمد
الطباطبائي الاردستاني اللهم اغفر لي ولامي
ولابي بجاه محمد وعلي

سنة ١٢٩٨

www.pathagar.com

ظماء مظمئين مسودة وجوهكم فيؤخذ بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة ثم ترد علي راية فرعون هذه
الامة فاقوم فاخذ بيده فترجف قدماه ويسود وجهه ووجوه اصحابه فاقول لهم ما فعلتم بالثقلين فيقولون
اما الاكبر فمزقنا واما الاصغر فبرئنا منه فاقول ردوا ظماء مظمئين مسودة وجوهكم فيؤخذ بهم ذات الشمال
لا يسقون قطرة ثم ترد علي راية ذي الثدية معها اول خارجة واخرها فاقوم فاخذ بيده فترجف قدماه ويسود
وجهه ووجوه اصحابه فاقول ما فعلتم بالثقلين بعدي فيقولون اما الاكبر فرقنا واما الاصغر فبرئنا منه
ولعناه فاقول ردوا ظماء مظمئين مسودة وجوهكم فيؤخذ بهم ذات الشمال لا يسقون قطرة ثم ترد علي
راية امير المؤمنين وسيد المسلمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين فاقوم فاخذ بيده فيبيض وجهه ووجوه
اصحابه فاقول لهم ما فعلتم بالثقلين بعدي فيقولون اما الاكبر فاتبعنا واطعنا واما الاصغر فقاتلنا معه حتى
قتلنا فاقول ردوا رواء مرويين مبيضة وجوهكم فيؤخذ بهم ذات اليمين وهو قول الله تعالى يوم تبيض
وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وانما ذكرنا تمام الخبر تيمنا وتبركا بذكر مثالب
القوم ومناقب الائمة الراشدين من لسان المخالفين وبانى انشاء الله ان الظاهر من التحريف تحريف اللفظ
لا المعنى سح صاحب كتاب دبستان المذاهب بعد ذكر عقايد الشيعة ما معناه وبعضهم يقولون ان عثمان
احرق المصاحف واتلف السور التي كانت في فضل علي واهل بيته عليهم السلام منها هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالنُّورَيْنِ أَنْزَلْنَاهُمَا يَتْلُوَانِ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُحَذِّرَانِكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
نُورَانِ بَعْضُهُمَا مِنْ بَعْضٍ وَأَنَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يُوفُونَ وَرَسُولَهُ فِي آيَاتٍ لَهُمْ جَنَّاتُ نَعِيمٍ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا آمَنُوا بِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَمَا عَاهَدَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ يُقْذَفُونَ فِي الْجَحِيمِ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَعَصَوُا الْوَصِيَّ الرَّسُولِ أُولَئِكَ يُسْقَوْنَ مِنْ حَمِيمٍ إِنَّ اللَّهَ الَّذِي نَوَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِمَا شَاءَ وَاصْطَفَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَجَعَلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُولَئِكَ فِي خَلْقِهِ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِرُسُلِهِمْ فَأَخَذْتُهُمْ بِمَكْرِهِمْ إِنَّ أَخْذِي شَدِيدٌ أَلِيمٌ
إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ بِمَا كَسَبُوا وَجَعَلَهُمْ لَكُمْ تَذْكِرَةً فَلَا تَتَّقُونَ وَفِرْعَوْنَ بِمَا طَغَى عَلَى
مُوسَى وَأَخِيهِ هَرُونَ أَغْرَقْتُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ أَجْمَعِينَ لِيَكُونَ لَكُمْ آيَةً وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ إِنَّ
اللَّهَ يَجْمَعُهُمْ فِي يَوْمِ الْحَشْرِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْجَوَابَ حِينَ يُسْئَلُونَ إِنَّ الْجَحِيمَ مَأْوَاهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

www.pathagar.com

يا ايها الرسول بلغ انذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن اياتي وحكمي معرضون مثل
الذين يوفون بعهدك اني جزيتهم جنات النعيم ان الله لذو مغفرة واجر عظيم وان عليا من
المتقين وانا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على اهلك اجمعين فانه
وذريته لصابرون وان عدوهم امام المجرمين قل للذين كفروا بعد ما امنوا اطلبتم
زينة الحيوة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود
من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الامثال لعلكم تهتدون يا ايها الرسول قد انزلنا اليك
الايات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون فاعرض عنهم انهم معرضون
انا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون ان لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون
فسبح باسم ربك وكن من الساجدين ولقد ارسلنا موسى وهرون بما استخلف فبغوا هرون
فصبر جميل فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم الى يوم يبعثون فاصبر فسوف يبصرون
ولقد اتينا بك الحكم كالذين من قبلك من المرسلين وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون
ومن يتول عن امري فاني مرجعه فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسئل عن الناكثين يا ايها الرسول
قد جعلنا لك في اعناق الذين امنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين ان عليا قانتا بالليل
ساجدا يحذر الاخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون سنجعل
الاغلال في اعناقهم وهم على اعمالهم يندمون انا بشرناك بذريته الصالحين وانهم لامرنا لا
يخلفون فعليهم مني صلوات ورحمة احياء وامواتا يوم يبعثون وعلى الذين يبغون عليهم
من بعدك غضبي انهم قوم سوء خاسرين وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات
امنون والحمد لله رب العالمين **قلت** ظاهر كلامه انه اخذها من كتب الشيعة ولم اجد لها اثرا
فيها غير ان الشيخ محمد بن علي بن شهر اشوب المازندراني ذكر في كتاب المثالب على ما حكي عنهم
اسقطوا من القران تمام سورة الولاية ولعلها هذه السورة والله العالم يه على بن عيسى الاربلي في
كشف الغمة عن طريق العامة عن زيد بن عبد الله قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ يا ايها
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان عليا مولى المؤمنين فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله
يعصمك من الناس ع الشيخ محمد بن احمد بن شاذان الفقيه في المناقب المائة من طريق المخالفين

www.pathagar.com

এছাড়া কুয়েতের একজন বর্তমান শীয়া আলিম মির্জা হাসান হায়েরী ১৩৯৪ হিজরীতে তার "الدين بين السائل والمجيب" গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠায় কুরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের জওয়াবে লিখেছেন ঃ

فأول من جمعه وجعله بين دفتين كتاباً هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وورث هذا التراث امام بعد امام من ابنائه المعصومين عليهم السلام وسوف يظهره الامام المنتظر المهدي اذا ظهر ..... واما مصحف فاطمة فهو مثل القران ثلاث مرات وهو شئ املاه الله و أوحى اليها -

'সর্বপ্রথমে যিনি কুরআনকে সংকলন করেছেন এবং গ্রন্থের আকার দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব আঃ। আর এই কুরআনকে তাঁর নিষ্পাপ বংশধরের একজন ইমামের পর আর একজন ইমাম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আর ইমাম মেহদী মুন্তাজার যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন তিনি এটাকে প্রকাশ করবেন।.....আর ফাতেমার মাসহাফ এই কুরআনের তিনগুন। সেটা এমন এক বস্তু যা আল্লাহ লিখেছেন এবং তা ফাতেমার নিকট অহী করেছেন।'

মির্জা হাসান হায়েরীর এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোন ইমামীয়া শীয়া ব্যক্তি প্রতিবাদ করেননি। বরং যে সব শীয়া আজকাল তাদের তাকিয়্যাহ নীতি অনুসরণ করে কুরআনকে পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে পবিত্র বলে মত প্রকাশ করেন তারাও আল কাফীর গ্রন্থকার কোলাইনী ও তার বর্ণনাকারী তাবরাসীর উল্লেখ কালে তাদের জন্য নেক দোয়া করে থাকেন। অপর দিকে সমস্ত ইমামীয়া শীয়া সম্প্রদায় সর্বসম্মতভাবে সাহাবী (রাঃ) দের উপর বিশেষ করে আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) এর উপর আমানতের খেয়ানত করার দোষারোপ করে থাকেন। এমতাবস্থায় সাহাবীদের (রাঃ) সংকলিত মূল কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা এবং সেটাকে সম্পূর্ণ সঠিক বলে বিশ্বাস করা শীয়াদের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে আলী (রাঃ) এর সংকলিত কুরআনের কথা তাদের হাদীসের কিতাবে বর্ণিত থাকায়, সেটাই তাদের নিকট বিশ্বস্ত কুরআন। কিন্তু সেটা তো তাদের মতে এখনও গুপ্ত অবস্থায় আছে এবং মেহদী মুন্তাযার এসে নাকি তা প্রকাশ করবেন।

কুরআনে বিকৃতির অপবাদ

শীয়া আলিম নে'মাতুল্লাহ আল জাযায়েরীর মতে কুরআনকে বিকৃত করা হয়েছে বলে প্রমাণ করে এমন দু'হাজারের ও বেশী হাদীস শীয়াগণ বর্ণনা

www.pathagar.com

করেছেন। তাদের বিখ্যাত আলিম মুফীদ اوائل المقالات (আওয়ায়েলুল মাকালাত) গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"اقول ان الاخبار قد جاءت مستفيضة عن ائمة الهدى من ال محمد (ص) باختلاف القران و ما احدثه بعض الظالمين فيه من الحذف و النقصان" ।

"আমি বলছি যে মুহাম্মাদ (সঃ) এর বংশধর সঠিক পথের ইমামদের কাছ থেকে এমন হাদীস সমূহ পাওয়া গিয়েছে যাতে কুরআনের বিভিন্নতার কথা আছে এবং কতিপয় জালিম লোকেরা যে তার কতক অংশ বাদ দিয়ে তাকে কম করে ফেলেছে তারও উল্লেখ আছে।"

তিনি উক্ত গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় কুরআনের সংকলন ঠিকমত হয়নি বলে ইমামীয়া শীয়াদের ইজমা বা সর্বসম্মত মত উল্লেখ করেছেন। শীয়াদের একজন শ্রেষ্ঠ আলিম মাজলিস তার কেরাআতুল উকুল (قرأة العقول) গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে কুরআনকে বিকৃত করা সম্পর্কীয় হাদীস বহু রয়েছে।

স্বয়ং জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী কুরআনের ব্যাপারে কি আকিদা রাখেন তা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করলেই বুঝা যায়।

(১) জনাব খোমেনী এবং তাঁর সাথীগণ পূর্বোল্লেখিত فصل الخطاب গ্রন্থের লেখক তাবরাসীর مستدرک الوسائل কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য রহমতের দোয়া করেছেন। আল কাফী থেকে তিনি বহু হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাবরাসীর "الاحتجاج" গ্রন্থ থেকেও তিনি ফায়দা হাসিল করেছেন.

এ ছাড়া তোহ্ফাতুল আওয়াম (تحفة العوام مقبول جديد) গ্রন্থ খানা যে ছয়জন আয়াতুল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত,তার মধ্যে রুহুল্লাহ খোমেনীও রয়েছেন। এ বইতে কোরাইশের দুটি দেব মূর্তিকে লানত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের উপর কুরআনকে বিকৃত করার দোষ আরোপ করা হয়েছে। শীয়াদের আকীদা অনুযায়ী এ দুটি দেব মূর্তি হচ্ছেন আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)।

এছাড়া আলকাফী ২য় খণ্ডের ৬৩৪ পৃষ্ঠায় আলী ইবনে হাকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আবু আবদুল্লাহ (আঃ) বলেছেন ঃ 'যে কুরআন জিবরীল (আঃ) মুহাম্মাদ (সঃ) এর নিকট এনেছেন তা ১৭ হাজার আয়াত।'

www.pathagar.com

উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬৩৩ পৃষ্ঠায় সালেম ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ ইমাম মেহেদীর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান কুরআন পড়তে বলেছেন। তারপর ইমাম মেহদী এসে পৃথক কুরআন পড়বেন। আর সে কুরআনকে আলী (রাঃ) লিখেছেন।

উক্ত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে আবু জা'ফর বলেছেন; "যে ব্যক্তি দাবী করে যে সে সম্পূর্ণ কুরআনকে সংকলিত করেছে সে মিথ্যাবাদী। কুরআনকে আল্লাহ্ যেভাবে নাযিল করেছেন ঠিক সে ভাবে একমাত্র আলী ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণই সংকলিত ও সংরক্ষিত করেছেন।"

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে মুসলিম উম্মাতের গৃহীত প্রকৃত কুরআনের আয়াতের সংখ্যা মোট ৬ হাজার ২ শত ৩৬ (৬২৩৬)। আর শীয়াদের কুরআনের আয়াতের সংখ্যা মোট ১৭ হাজার। আর তা নাকি আলী (রাঃ) ও তাদের অন্যান্য ইমামগণ লিখেছেন ও সংকলন করেছেন। শীয়া হাদীস গ্রন্থ আল কাফীর প্রণেতা কোলাইনী এসব কথা আহলে বাইত এর বলে উল্লেখ করে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা করেছেন এবং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করেছেন। অথচ জনাব খোমেনী সহ সমস্ত শীয়াদের নিকট এ লোকটি ও তার গ্রন্থ আল কাফী সবচেয়ে বেশী মনঃপূত ও বিশ্বস্ত।

কুরআন সঠিক ও অবিকৃত

কুরআন সম্পর্কে শীয়াদের এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার কারণে আল্লামা ইবনে হাযম (রঃ) তাঁর الفصل فى الملل والا هواء والنحل গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

فان الروافض ليسوا من المسلمين ... ... وهى طائفة تجرى مجرى اليهود و النصارى فى الكذب و الكفر -

'ইমামীয়া শীয়ারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়। — — — তারা এমন একটি সম্প্রদায় যারা মিথ্যা ও কুফরের ব্যাপারে ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের পথে চলে।

আল্লামা ইবনে হাযম (রঃ) তাঁর উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৮০ ও ৮১ পৃষ্ঠায় কুরআন সম্পর্কে শীয়াদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

"(খিলাফাতে রাশেদার যুগে) প্রত্যেক শহরেই মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে এবং সেখানে কুরআনের বহু কপি রাখা হয়েছে। অগণিত লোক ও সমস্ত আলেমগণ তা পড়েছেন। সারা দুনিয়ার সর্বত্র বালক-বালিকা, যুবক ও বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলা সকলেই কুরআন শিক্ষা লাভ করেছেন। এভাবে উমর (রাঃ) এর খিলাফাত পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছরের ও বেশী চলে গিয়েছে। সে সময় কোন মতভেদ কোথাও দেখা যায়নি। তারপর উসমান (রাঃ) এর যুগে তো কুরআনের অসংখ্য কপি বিতরণ করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পেয়েছে। এরূপ অবস্থায় ১২ বছর চলে গিয়েছে। সে সময়ও কোন মতভেদ হয়নি। উসমান (রাঃ) এর ইন্তেকালের পর নানা প্রকার রাজনৈতিক মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দেয়। তখন শীয়াদের কার্যকলাপ শুরু হয়। ... ...সে সময় উন্দলুস ও সুদান থেকে ভারতবর্ষ, খোরাসান ও তুরস্ক পর্যন্ত একই কুরআন সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে চালু ছিল। এমতাবস্থায় কুরআনের কোন প্রকার বিকৃতি সম্ভবপরই ছিলনা।

আলী (রাঃ) এর প্রতি যে মিথ্যা শীয়ারা আরোপ করেছেন তার অসারতা এভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি পাঁচ বছর ৯ মাস পর্যন্ত খালীফা ছিলেন। সীরিয়া ও মিসর ছাড়া আর সব দেশই তাঁর আনুগত্য করেছে। আর কুরআন তখন বিশাল খিলাফাতের সব যায়গায় তেলাওয়াত করা এবং ব্যাপকভাবে কুরআনের শিক্ষাদান করা হচ্ছিল। তিনি মুসলিম উম্মাতের নেতৃত্বের আসনে ছিলেন। তিনি নিজে নামাযের ইমামাত করছিলেন। যদি কুরআনে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হত, তবে তিনি তা অবশ্যই দেখতেন এবং তার সংশোধন করতেন। এরপর হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) ও কুরআনে কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখতে পাননি। এরূপ কোন কিছু হলে তা তাঁরা অবশ্যই জানতেন এবং সেজন্য জিহাদ করতেন।

কুরআনকে হেফাযাত করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। وانا له لحافظون (الحجر) (আমিই তার রক্ষক)। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে কুরআন লিখিত হয়েছে। হাজার হাজার সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ী তা মুখস্থ করেছেন। গোটা মুসলিম উম্মাহ আজ পর্যন্ত সেই কুরআনকেই গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু শীয়ারা এ কুরআনকে বিকৃত বলে বিশ্বাস ও প্রচার করে থাকেন। শীয়াদের এ আকীদা মূলতঃ আল্লাহ, রসূল ও গোটা মুসলিম উম্মাতের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে তারা আল্লাহ, রসূল (সঃ) ও সাহাবা (রাঃ) এর প্রতি জঘন্য মিথ্যা আরোপ করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)।

www.pathagar.com

হাদীস সম্পর্কে শীয়া আকীদা

শীয়া মতবাদে হাদীস ঃ

আমরা দেখতে পাই যে শীয়াগণ ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হাদীসের ব্যাপারেও মুসলিম উম্মাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা বুখারী, মুসলিম তিরমিযি, আবূ দাউদ, নেসায়ী, ইবনে মাজা, মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থ সমূহকে সঠিক বলে বিশ্বাস করেন না। অথচ গোটা মুসলিম উম্মাত চিরকাল এসব গ্রন্থকে সঠিক ও বিশ্বস্ত বলে বিশ্বাস করে আসছে।

শীয়াদের মতে যে সব হাদীস তাদের ইমামদের নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে শুধু সে গুলোই তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। আর তারা ইমামদের সমস্ত কথা এবং কাজও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কথা এবং কাজের মতই সঠিক হাদীস বলে বিশ্বাস করেন। কারণ তাদের ইমামদেরকে তারা নিষ্পাপ, ত্রুটিহীন ও ভুলহীন বলে বিশ্বাস করেন। তাই তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর স্ত্রীগণ এবং হাজার হাজার সাহাবীর বর্ণিত হাদীসকে গ্রহণ করেন না। তবে মুসলিম উম্মাতের বিরুদ্ধে নিজেদের আকীদা বিশ্বাসকে চালু করার জন্য যুক্তি প্রমান পেশ করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় বুখারী, মুসলিম ইত্যাদির হাদীসকে উল্লেখ করে তার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এবং ভুল হাওয়ালাও দিয়ে থাকেন।

سماء رجال। বা হাদীস বর্ণনা কারীদের সম্পর্কে তারা সঠিক জ্ঞান লাভ করারও প্রয়োজন বোধ করেন না। কোন শীয়া বর্ণিত হাদীস হলেই সেটাকে তারা সঠিক বলে গ্রহণ করে থাকেন। বর্ণনাকারীর শীয়া হওয়াটাই তার বর্ণিত হাদীসের সত্যতার মাপকাঠি। যত বড় নির্ভেজাল মিথ্যা কথা হোক না কেন তা যদি কোন শীয়া বর্ণনা করে থাকে এবং সেটা যদি শীয়া মতবাদের সহায়ক হয় তবে তা তাদের নিকট সত্য ও সঠিক বলে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। তাদের হাদীস সংগ্রহের তেমন কোন নিয়ম নীতি নেই। মুসলিম উম্মাতের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ সঠিকভাবে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার উদ্দেশ্যে সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হাদীস বিচার করা এবং হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত পুংখানুপুংখ ভাবে লিপিবদ্ধ করার বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হাদীস বিজ্ঞান প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু শীয়াগণের নিকট তাঁদের এই অবদানের কোন গুরুত্বই নেই।

www.pathagar.com

শীয়াদের হাদীস গ্রন্থ

শীয়াদের শ্রেষ্ঠতম বিশ্বস্ত হাদীসগ্রন্থ হচ্ছে "আল কাফী!" এ গ্রন্থটি তাদের নিকট আমাদের বুখারী শরীফের মর্যাদা সম্পন্ন। আল কাফী থেকে কুরআন সম্পর্কে যে বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা দ্বারাই এ গ্রন্থের অসারতা ও অসত্যতা প্রমাণিত হয়। তবুও সকলের অবগতির জন্য এখানে এ গ্রন্থের আরও পরিচয় পেশ করা দরকার। এ গ্রন্থের লেখক কোলাইনী মনগড়া হাদীস বর্ণনায় খুবই দক্ষ। এ গ্রন্থটিতে যে অসংখ্য মনগড়া হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রমাণ এর কতিপয় পরিচ্ছেদের নিম্নোক্ত শিরোনামা পড়লেই বুঝা যায়।

(১) باب ان الائمة ولاة امر الله وخزنة علمه (২) باب ان الائمة هم اركان الارض (৩) باب ان الائمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف السنتها (৪) باب انه لم يجمع القران كله الا الائمة (৫) باب ان الائمة يعلمون جميع العلوم التى خرجت الى الملائكة والانبياء والرسل (৬) باب ان الائمة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم (৭) باب ان الائمة يعلمون علم ماكان و مايكون وانه لايخفى عليهم شئى (৮) باب ان الله لم يعلم نبيه علماً الا امره ان يعلمه امير المؤمنين وانه كان شريكه فى العلم (৯) باب ان الائمة لو ستر عليهم لاخبروا كل امرئى بما له وعليه (১০) باب وقت مايعلم الامام جميع علم الامام الذى قبله (১১) باب ان الامام يعرف الامام الذى يكون من بعده (১২) باب فى ان الائمة اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وال داؤد ولا يسئلون البينة (১৩) باب انه ليس شئى من الحق فى ايدى الناس الاماخرج من عند الائمة وان كل شئى لم يخرج من عندهم فهو باطل (১৪) باب ان الارض كلها للامام -

(১) পরিচ্ছেদঃ ইমামগণ আল্লাহর হুকুম প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ ও তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার।

(২) পরিচ্ছেদঃ ইমামগণই বিশ্বের স্তম্ভ সমূহ।

www.pathagar.com

(৩) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামদের নিকটই সমস্ত কিতাব রয়েছে, তারা সে গুলোকে বিভিন্ন ভাষায় হওয়া সত্বেও জানেন।

(৪) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামগণ ছাড়া আর কেউ সম্পূর্ণ কুরআনকে সংকলিত করেনি।

(৫) পরিচ্ছেদ ঃ নবী, রসুল ও ফেরেশতাদের নিকট যত জ্ঞান এসেছে তা সবই ইমামগণ জানেন।

(৬) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামগণ জানেন যে তারা কখন মরবেন। আর তারা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়া মরেন না।

(৭) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামগণ অতীতে যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তার সব জ্ঞান রাখেন। আর তাদের কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না।

(৮) পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ) কে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তা আমীরুল মুমেনীনকে (আলী রাঃ) অবশ্য শিক্ষা দেয়ার জন্য হুকুম করেছেন। আর তিনি (আলী রাঃ) তাঁর (রসুলুল্লাহ সঃ এর) সাথে জ্ঞানের ব্যাপারে শরীক ছিলেন।

(৯) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামগণকে কোন পর্দার অন্তরাল করে দিলে তারা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ও বিপক্ষের সব খবর বলতে পারেন।

(১০) পরিচ্ছেদ ঃ এক ইমাম তার পূর্ববর্তী ইমামের সমস্ত জ্ঞান লাভ করার সময়।

(১১) পরিচ্ছেদ ঃ এক ইমাম তার পরবর্তী ইমামকে চিনেন।

(১২) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামগণ দাউদ (আঃ) ও তাঁর বংশধরের ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা করেন। আর তারা এর জন্য কোন দলীল প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন না।

(১৩) পরিচ্ছেদ ঃ ইমামদের নিকট থেকে যা কিছু এসেছে তা ছাড়া অন্য কোন সত্য মানুষের হাতে নেই। আর যা কিছু তাদের নিকট থেকে আসেনি তা বাতিল।

(১৪) পরিচ্ছেদ ঃ গোটা বিশ্বই ইমামের জন্য।

মুসলিম উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের পরিবর্তে শীয়াগণ যে আল কাফীকে শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তা যে কতটা বাতিল ও মনগড়া তা উল্লেখিত পরিচ্ছেদ গুলোর শিরোনামা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদীস আর তা যদি শীয়াদের ইমামগণের কথা ও কাজ এবং তাদেরই বর্ণিত হাদীস হয়, তা হলে গোটা ইসলামই বিকৃত হয়ে যায়। তাদের ইমামদের তথা কথিত হাদীস দ্বারা প্রকৃত দ্বীন ইসলামকে বুঝা সম্ভব নয়। উক্ত হাদীস দ্বারা মুসলিম উম্মাতের গৃহীত আল্লাহর কুরআনকে বুঝা যেতে পারে না, বরং শীয়াগণ যে মাস্‌হাফে ফাতেমা নামক কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন তা বুঝা যেতে পারে। আর শীয়াদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই তথা কথিত হাদীস ও বিকৃত ইসলামের শিক্ষাই দেয়া হয়। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে সঠিক ইসলামের আলেম বলে গণ্য করা যে ঠিক নয় তা সহজেই অনুমেয়।

সাহাবীগণ সম্পর্কে শীয়া আকীদা

রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর হাজার হাজার সাহাবীগণকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে আদর্শ পুরুষ হিসেবে গঠন করেছেন। তাঁরা ছিলেন নাবী (সঃ) এর আদর্শ অনুসারী। নাবী (সঃ) এর পূর্ণ ও সঠিক অনুসরণের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাতের জন্য তাঁরাই বাস্তব নমুনা। তাঁদের সম্পর্কে কুরআনের কতিপয় প্রশংসামূলক আয়াত নাযিল হয়েছে। তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁরাই সত্যের মাপকাঠিতে পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের ত্যাগ ও কোরবানী, ইখলাস ও সততা, আমানতদারী ও সত্যবাদিতা এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অসাধারণ মহব্বতের কোন তুলনা নেই। তাই মুসলিম উম্মাহ তাঁদের অনুসরণকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঠিক আনুগত্য বলে গণ্য করেছে। অথচ শীয়ারা শুধু আলী (রাঃ) মেকদাদ (রাঃ), আবু যর (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) ও আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) কে মুমিন বলে মনে করেন। বাকী সাহাবীদের মধ্যে আবু বকর ও উমর (রাঃ) কে তো তারা জিব্‌ত্‌ ও তাগুত অর্থাৎ শয়তান আখ্যা দিয়ে চরম কটাক্ষ করেছেন। আল কাফী ১ম খণ্ডের ২২৭—২৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এ বিবরণ পাওয়া যায়।

শীয়াদের মতে সাহাবীগণ ছিলেন মুনাফিক তাই তাদের ষড়যন্ত্র মূলক পরিকল্পনা বুঝতে পেরে নাবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে উসামা (রাঃ) এর নেতৃত্বে এক সৈন্যদল সংগঠিত করে তার সাথে বড় বড় সাহাবীদেরকে যুক্ত করেছিলেন। যাতে করে মুনাফিক দল থেকে মদীনা পবিত্র হয়ে যায় এবং ইমামের (আলী রাঃ) বাইয়াত হয়ে যায়। ইবনে আবুল হাদীদ নাহ্‌জুল বালাগার ব্যাখ্যা গ্রন্থে শীয়াদের পক্ষ থেকে উক্ত মন্তব্য উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

আর মিনহাজুল কারামাহ্ গ্রন্থের লেখক ইবনে মোতাহহারও উক্ত মন্তব্য সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। আর বর্তমান যুগের হাসান আমীন দায়েরাতুল মায়ারিফ প্রথম খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় এ মন্তব্যকে সঠিক বলে আবার পেশ করেছেন। জনাব রুহুল্লাহ খোমেনীও তার আল হুকুমাতুল ইসলামীয়ার ৬৯ পৃষ্ঠায় উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন দিয়েছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠায় আলী (রাঃ) এর ইমামাতের সমর্থন দিতে গিয়ে সাহাবীদের সম্পর্কে লিখেছেন :

"و فى غدير خم فى حجة الوداع عينه النبى صلعم حاكما من بعده ومن حينها بدأ الخلاف يدب الى نفوس قوم"

(الحكومة الاسلامية صفحه ١٣١)

অর্থাৎ "হাজ্জাতুল বিদার সময় গাদীরে খুমে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে (আলী রাঃ-কে) তাঁর পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করেছেন। আর তখন থেকেই একদল লোকের (সাহাবীদের) মনে বিরোধীতা চলতে লাগল।"

সমস্ত ইমামীয়া শীয়াদের সর্বসম্মত দাবী যে রসুলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সাহাবীগণ তাঁর এই নিযুক্তি স্বীকার করেননি। একথা দ্বারা সাহাবীদের আমানতদারীর বিরুদ্ধে খেয়ানতের অপবাদ দেয়া হয়েছে এবং রসুলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।

আল মুস্তাকা ৬৪ পৃষ্ঠা

আহলে বাইত সম্পর্কে শীয়া আকীদা

আহলে বাইত নিষ্পাপ ছিলেন কি ?

শীয়ারা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর আহলে বাইত বা পরিবার বর্গ সম্পর্কে আকীদা রাখেন যে আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এবং তাদের বংশধর ১২নং ইমাম পর্যন্ত সকলেই নাবী (সঃ) এর মতই বিনা পার্থক্যে সমস্ত প্রকার পাপ থেকে পবিত্র ও মা'সুম। এমনকি শীয়ারা তাদের সম্পর্কে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভুল ভ্রান্তির ধারনাই করতে পারেন না। আহলে বাইত সম্পর্কে তাদের এ আকীদার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তারা এই আয়াতটির অপব্যাখ্যা করেছেন।

www.pathagar.com

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا (الاحزاب)

মুসলিম উম্মাতের নিকট এ আয়াতের সর্বসম্মত অর্থ এই যে "আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবার বর্গ থেকে সর্ব প্রকার 'অপবিত্রতা' দূর করে দিয়ে তাদেরকে ভালভাবে পবিত্র করতে চান।" আয়াতে 'رجس' শব্দটির অর্থ যদি গোনাহ বা পাপ ধরা যায়, তাহলেও এ কথার অর্থ এটা হতে পারেনা যে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবারবর্গ নিষ্পাপ বা বেগোনাহ্ ছিলেন। এ আয়াতে আল্লাহ আহ্লে বাইতকে পবিত্র করে দিয়েছেন এরূপ কথা বলেননি। এ আয়াতের আগে ও পরে কতকগুলো দ্বীনী কাজ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। সে সব হুকুম দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আহলে বাইত সেগুলো করলে আল্লাহ তাঁদেরকে তাদের আমলের মাধ্যমে পবিত্র করে দিতে চান। পবিত্র করতে চাওয়া এক কথা, আর পবিত্র ছিলেন বা হয়েছিলেন অন্য কথা। পবিত্র থাকলে তো আর পবিত্র করতে চাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কাজেই এ আয়াত থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে তাঁরা আল্লাহর নিকট অভিষ্ট মর্যাদা অনুযায়ী পবিত্র ছিলেন না বলেই তিনি তাদেরকে পবিত্র করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু শীয়ারা নিজেদের ইচ্ছামত এ আয়াতের অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বাস করেন যে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবারবর্গ নিষ্পাপ ছিলেন। তাদের এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক ধরে নেয়া হয়, তবে তো অন্য আয়াতে আল্লাহ গোটা মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কেও বলেছেন যে তিনি তাদেরকে পবিত্র করতে চান। তিনি বলেছেন ঃ

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم .....(المائدة)

"আল্লাহ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চান না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।" (আল মায়েদাহ্)।

পবিত্র করার যে অর্থ শিয়ারা গ্রহণ করেছেন তদনুযায়ী এ আয়াতের ভিত্তিতে তো সমস্ত সাহাবা (রাঃ) ও মুসলিম উম্মাতের সকলকেই নিষ্পাপ ও পবিত্র বলতে হয়। কিন্তু তা যেমন ঠিক নয়, তেমনি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবার সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা তাদেরকে নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করাও ঠিক নয়। এরূপ করলে উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যাই হয়। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী (রঃ) তাঁর তাফসীর রূহুল মায়ানী

www.pathagar.com

গ্রন্থে লিখেছেন যে শীয়াদের মহাগ্রন্থ নাহ্‌জুল্‌ বালাগা'তে আছে যে স্বয়ং আলী (রাঃ) তাঁর সাথীদেরকে বলেছেন ঃ

"ولاتكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فانى لست بفوق ان اخطئى ولا امن من ذلك فى فعلى" (روح المعانى المجلد السابع صفحه ١٨)

"তোমরা কোন হক কথা বলা বা ইনসাফের পরামর্শ দেয়া থেকে বিরত থাকবে না। কারণ আমি ভুল করার উর্ধে নই। আর আমার কাজে আমি ভুল (ভুল) থেকে নিরাপদে নই।" (রূহুল মায়ানী ৭ম খণ্ডের ১৮ পৃষ্ঠা)

আলী (রাঃ) এর এই বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে তিনি ভুলের উর্ধে ছিলেন না। কাজেই তিনি মাসুম বা নিষ্পাপও ছিলেন না। শীয়াদের প্রথম ইমামই যখন মা'সুম বা নিষ্পাপ নন বলে প্রমাণিত হল, তখন তাঁর পরবর্তী ১১ জন ইমাম মাসুম হওয়ার তো প্রশ্নই উঠেনা।

এছাড়া আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ البداية والنهاية ৭ম খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠায় জামাল যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে আলী (রাঃ) এর একটি আক্ষেপ পূর্ণ কথা লিখেছেন ঃ

"قال سعيد بن ابى عجرة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عبادة قال قال على يوم الجمل : ياحسن ليت اباك مات منذ عشرين سنة فقال له : يا ابة قد كنت انهاك عن هذا - قال يابنى انى لم ار ان الامر يبلغ هذا" -

সাঈদ ইবনে আবু উজরা (রাঃ) কাতাদা রাঃ) থেকে এবং তিনি হাসান (রাঃ) থেকে এবং তিনি কাইস ইবনে উবাদাহ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে আলী (রাঃ) জামাল যুদ্ধের দিনে বলেছিলেন ঃ "হে হাসান! আহা তোমার আব্বা যদি এ ঘটনার ২০ বছর পূর্বে মরে যেত"। হাসান (রাঃ) বললেন ঃ "হে আব্বা! আমি তো আপনাকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম।" তিনি (আলী) বললেন ঃ "হে আমার পুত্র! আমি তো বুঝতে পারিনি যে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে।"

এ বর্ণনার অর্থ এই যে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর সাথে হযরত আলী (রাঃ) জামাল নামক যে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) সে যুদ্ধ করতে তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে বহু মুসলিম শহীদ হওয়ায় হযরত আলী (রাঃ) নিজের ভূমিকায়

www.pathagar.com

দুঃখিত হয়ে হাসান (রাঃ) এর নিকট এ ঘটনার বিশ বছর পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল না হওয়ায় আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে তিনি নিজেকে ভুলের উর্ধে মনে করতেন না। তারপর ব্যাপারটা যে এরূপ আত্মঘাতি যুদ্ধের রূপ নেবে এবং বহু মুসলিম শহীদ হবেন তাও তিনি পূর্বে বুঝতে পারেন নি। এ ঘটনার বিশ বছর পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণের আকাংখা প্রকাশ করলেও তা হয়নি। শীয়াদের ২য় নিষ্পাপ ইমাম হযরত হাসান (রাঃ) এর নিষেধও তিনি মানেননি। এসব বাস্তব তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে তিনি ভুলের উর্ধে ছিলেন না এবং নাবী (সঃ) এর মত মাসূ'ম ছিলেন না। শীয়াদের আল কাফী গ্রন্থে লিখিত আছে যে তাদের ইমামগণ ভবিষ্যৎ জানেন এবং ইচ্ছামত মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) এর বাণী দ্বারা সে আকীদা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

আহলে বাইত কারা ?

আলোচ্য আয়াতে যে 'আহলে বাইত' এর কথা রয়েছে, শীয়ারা তার সীমিত অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে শুধু আলী (রাঃ) হাসান (রাঃ), হুসাইন (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) এবং তাদের বংশধর ১২ নং ইমাম পর্যন্ত ব্যক্তিগণই রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কোন স্ত্রী এমনকি ফাতেমা (রাঃ) এর মাতা উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রাঃ)ও রসূলুল্লাহ (সঃ) এর আহলে বাইত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন বলে শীয়ারা বিশ্বাস করেন। এ ছাড়া তাঁর বাকী তিন কন্যা রোকাইয়া (রাঃ), যয়নব (রাঃ) ও উম্মে সালামা (রাঃ) কেও শীয়ারা রসূল পরিবারের মধ্যে গণ্য করেন না। অথচ স্ত্রী ও সন্তানকে বাদ দিয়ে কোন পরিবারের ধারণাই করা যেতে পারেনা।

শীয়াদের মতে আহলে বাইত সম্পর্কীয় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) কে নিজ চাদর দিয়ে ঘিরে ফেলে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন যে,

"اللهم هولاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" -

"হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত। তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে ভাল করে পবিত্র করে দাও।"

এ হাদীসটিকে তিরমিযী, হাকেম, ইবনে জারীর, ইবনে মুনযের, ইবনে মারদবীয়া ও বায়হাকী তাঁদের গ্রন্থসমূহে উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। শীয়ারা এ হাদীসে উল্লেখিত চারজনকে এবং তাঁদের বংশধরের

www.pathagar.com

১২ নং ইমাম পর্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন। কিন্তু শীয়া মুফাসসির সা'লাবী বলেন যে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আহলে বাইতের মধ্যে হাশিম বংশের সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মহিলা শামিল রয়েছেন। মুসলিম উম্মাতের হানাফী ও কতক শাফেয়ীগণও উক্ত মত পোষণ করেন। সহীহ্ মুসলিমে যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে যাদের উপর সাদাকা হারাম করা হয়েছে তারা আহলে বাইত। আর তাঁরা হচ্ছেন আলী (রাঃ), আকীল (রাঃ), জাফার (রাঃ) ও আববাস (রাঃ) এর বংশধর।

আল্লামা আলুসী রুহুল মায়ানী ৮ম খন্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"অন্যান্য বর্ণনায় আছে যে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর অন্য কন্যাগণ, আত্মীয় স্বজন ও স্ত্রীগণকেও চাদরে শামিল করেছেন। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে আছে যে তিনি আহলে বাইতের মধ্যে শামিল কিনা তা রসূলুল্লাহকে (সঃ) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন "হাঁ ইনশা আল্লাহ"। এ কথাও আছে যে উম্মে সালামা (রাঃ)কে উক্ত চারজনের জন্য দোয়া করার পর চাদরে শামিল করেছেন। আর তিনি এ কাজ কয়েকবার করেছেন বলেও জানা যায়। আল্লামা মুহিবুবুত্ তাবারীও অনুরূপ কথা বলেছেন। উম্মে সালামা (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ) ও অন্যান্যদের ঘরেও অনুরূপ বৈঠক হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। যে সব বর্ণনায় উম্মে সালামা (রাঃ) কে চাদরে শামিল করা হয়নি বলে উল্লেখ্য করা হয়েছে তা দ্বারা একথা বুঝায় না যে তিনি আহলে বাইতের মধ্যে শামিল ছিলেন না। কারণ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এরূপ কথা বলেননি। মূল ব্যাপার এই যে আলোচ্য আয়াতটির আগেও পরের কথাগুলো নাবী স্ত্রীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বিভিন্ন হুকুম করা হয়েছে। মাঝখানে আহলে বাইতের কথা দ্বারা এরূপ ধারণাই স্বাভাবিক ছিল যে এতে শুধু স্ত্রীগণই শামীল রয়েছেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে স্ত্রীগণ ও অন্যান্যগণকে বাদ দিয়ে শুধু আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) কে চাদরে শামিল করে তাদেরকেও আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বিশেষ দোয়া করেছেন।"

পূর্বের আলোচনা ও আল্লামা আলুসীর বক্তব্য থেকে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে শীয়ারা যে চারজনের মধ্যে আহলে বাইতকে সীমিত করেছেন শুধু তাঁরাই আহলে বাইত নন। তাই তাঁরা ছাড়া আরও অনেকে আহলে বাইতের মধ্যে শামিল রয়েছেন বলে মুসলিম উম্মাত বিশ্বাস করে।

www.pathagar.com

শীয়ারা যে হাদীসটিকে তাদের দলীল হিসেবে পেশ করেন তার অর্থ এটা কিছুতেই হয় না যে শুধু উক্ত চারজন আহলে বাইত। এরূপ সীমিত অর্থে নাবী (সঃ) হাদিসটি বলেননি। বরং উক্ত চারজনও যাতে আহলে বাইতের মধ্যে শামিল হন সেজন্য তিনি দোয়া করেছেন। কিন্তু শীয়ারা এ হাদীসের অর্থ বিকৃত করে আহলে বাইতের নামে তাদের ১২ ইমামকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করেন। অথচ উক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারজনের বংশধরকে আহ্‌লে বাইত বলা হয়নি।

আহলে বাইত সম্পর্কে শীয়া আকীদার উদ্দেশ্য

শীয়ারা জানেন যে আহলে বাইত মুসলিম উম্মাতের নিকট বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। এদের সংখ্যা সীমিত করে নিষ্পাপ বলে গণ্য করলে হাজার হাজার সাহাবী (রাঃ) থেকে তাদেরকে পৃথক রাখা যাবে বলে শীয়ারা মনে করেছেন। এভাবে সমস্ত সাহাবী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে তাঁদেরকে দেখানোর মাধ্যমে সাহাবীদের (রাঃ) কে কাফের সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এরপর আহ্‌লে বাইতের প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন করে মনগড়া হাদীসকে তাঁদের বর্ণনা বলে সমাজে চালিয়ে দিয়ে এবং শুধু তাদের কাছ থেকে হাদীস নিয়ে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাজার হাজার সাহাবী (রাঃ) এর বর্ণিত মূল হাদীস ভান্ডার থেকে মুসলিম উম্মাহকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। এভাবে গোটা ইসলামকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে আহলে বাইতকে শীয়ারা তাদের মন মত সীমিত করে নিষ্পাপ বলে গণ্য করেছেন।

এছাড়া শীয়াদের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ আল কাফী থেকে তাদের ইমামদের যে সব গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্য এ পুস্তকে বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা বুঝা যায় যে তারা তাদের আহ্‌লে বাইত ইমামগণকে আল্লাহর মর্যাদা দান করেছেন। জনাব খোমেনী তো তার গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই উক্ত ইমামগণকে নাবী ও রসুলদের (সঃ) উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই রসুলুল্লাহ (সঃ) এর প্রতি শীয়াদের ঈমান অর্থহীন। বরং যে ইয়াহুদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা আলী (রাঃ) কে খোদা বলেছিল, আহলে বাইত সম্পর্কে শীয়াদের আকীদা তারই প্রতিধ্বনি। (নাউজুবিল্লাহ)

আহ্‌লে বাইতের প্রতি অতি ভক্তির স্বরূপ :

উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের পর মুনাফিকরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে নূতন সাহস পেল। তাই আলী (রাঃ) এর খিলাফাতের সময় তাদের ষড়যন্ত্র চারদিক থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাঁর খিলাফাত

www.pathagar.com

যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার সাথে মিলে একদিকে তাঁর সামনে সমর্থন ও অতি ভক্তি প্রকাশ করতে লাগল এবং অপরদিকে গোপনে তাঁর বিরোধীতা ও নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তাঁরা নিজেদেরকে আলী (রাঃ) এর শীয়া (দল) বলে প্রকাশ করত। কিন্তু কার্যতঃ তাঁর অবাধ্য ও দুশমন হিসেবে কাজ করত। তদানিন্তন শীয়াদের উক্ত ভূমিকা সম্পর্কে আলী (রাঃ) চরম ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে যে সব কথা বলেছেন তা শীয়াদের মহাগ্রন্থ নাহ্‌জুল বালাগাতে লিপিবদ্ধ আছে। রাযীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেছেন।

" قاتلكم الله لقد ملأ تم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهام انفاسا فافسدتم على رأيي بالخذلان والعصيان " -

"আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন। তোমরা আমার হৃদয়কে যখমে ভরে দিয়েছ। আমার মনকে দুশ্চিন্তা গ্রস্থ করেছ। তোমরা আমাকে দুঃখ ও কষ্টের ঢোক গিলিয়েছ। তোমরা আমার অবাধ্য হয়ে এবং আমাকে অপমান করে আমার মত ও নীতিকে নষ্ট করেছ।"

এ ছাড়া আলী ইবনে মুসা ইবনে তাউস বলেছেন ঃ

ان امير المؤمنين كان يدعو الناس على منبر الكوفة الى قتال البغاة فما اجابه الا رجلان فتنفس الصعداء وقال اين يقعان -

"আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ) কুফার মাসজিদের মেম্বারে উঠে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য লোকদেরকে ডাকলেন। কিন্তু দুজন ব্যতীত আর কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলনা। এতে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যে দুজন দিয়ে কোথায় কি হবে।"

ইবনে তাউস বলেছেন ঃ "তারা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে তাঁকে অপমান করেছে। অথচ তারা তাঁর প্রতি ভক্তিভরে এ বিশ্বাস প্রকাশ করে যে তাঁর আনুগত্য ফরয এবং তিনি হক পন্থী। আর যারা তাঁর বিরোধীতা করে তারা বাতিল পন্থী। তাদের এক দলকে কুফার মাসজিদে তাঁর প্রতি অপমানসূচক জঘন্য কথা বলতে শোনা গিয়েছে।"

নাহ্‌জুল বালাগা গ্রন্থে আরও আছে যে আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ

"اصبحت و الله لا اصدق قولكم ولا اطمع في نصركم وما اوعد العدو بكم " -

www.pathagar.com

"আমার এমন অবস্থা হয়েছে যে আমি তোমাদের কোন কথা সত্য বলে বিশ্বাস করিনা। তোমাদের কোন সাহায্যের আকাংখাও করিনা। আর তোমাদের দ্বারা আমি শত্রুকেও দমন করতে পারিনা।"

প্রথম যুগের মূল শীয়াদের উল্লেখিত ভূমিকা এবং তাদের সম্পর্কে আলী (রাঃ) এর চরম দুঃখ ও ক্ষোভপূর্ণ মন্তব্য ও বদ দোয়া দ্বারা আহলে বাইতের প্রতি তাদের অতি ভক্তি ও মহব্বতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এখন দেখা যাক তাদের পরবর্তী ইমাম হাসান (রাঃ) এর সাথে তারা কেমন ব্যবহার করেছেন।

তদানিন্তন শীয়ারা মুনাফিকদের সাথে মিশে হাসান (রাঃ) কে ইমাম ঠিক করে তাঁর নিকট বাইয়াত করলেন এবং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করার জন্য তাঁকে প্রস্তুত করলেন। তারপর কুফা থেকে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করলেন। তাই তারা পথিমধ্যে বেতনের ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ করে তাঁকে মনকষ্ট দিলেন এবং অশালীন কথা ও বেআদবীপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন। এমনকি যে মুখতার সাকাফী তাঁর খুব ভক্ত ও বড় সাহায্যকারী শীয়া হিসেবে নিজেকে প্রদর্শন করত সেই তাঁর পায়ের নীচ থেকে জায়নামায ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর একজন তাঁর পায়ে কোদালের মত কোন কিছু নিক্ষেপ করল। তারপর যুদ্ধের সময় এলে তারা তাঁর পক্ষ ছেড়ে আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) পক্ষ অবলম্বন করল। এরূপ ধোকাবাজী ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তদানিন্তন শীয়াদের মূল চেহারা ধরা পড়েছে। ইমামীয়া শীয়াদের বিশ্বস্ত "আলফাসূল"(الفصول) গ্রন্থে এসব বর্ণনা আছে।

শীয়াদের পূর্ব পুরুষদের অধিকাংশ ছিলেন কুফায়। কুফাবাসী শীয়ারা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর নয়নমণি এবং ফাতেমা (রাঃ) এর কলিজার টুকরা হুসাইন (রাঃ) কে বার বার ভক্তি ও দরদ ভরা পত্র পাঠিয়ে মাদীনা থেকে কুফায় যেতে বহু অনুনয় বিনয়পূর্ণ অনুরোধ জানালেন। হুসাইন (রাঃ) তাদের অনুরোধে কুফার দিকে রওয়ানা হলেন। তারপর পথিমধ্যে কারবালা প্রান্তরে শীয়াদের চক্রান্তে তাঁকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হল। তখন শীয়ারা তাঁর পক্ষে দুশমনদের মোকাবিলা করেননি। এমনকি কোন স্থান থেকে তারা তাঁকে কোনরূপ সাহায্যও করেননি। বরং দুশমনদের সাথে হাত মিলায়ে তাঁর শাহাদাতের ঘটনা ঘটালেন।

শীয়াদের এই ভূমিকা সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) "البداية والنهاية" গ্রন্থের ৮ম খন্ডের ১৭৯ পৃষ্ঠায় স্বয়ং হুসাইন (রাঃ) এর

www.pathagar.com

আর্তনাদ বর্ণনা করেছেন। কারবালার মাঠে হুসাইন (রাঃ) যুদ্ধের পূর্বে কতিপয় কুফাবাসী শীয়াদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يا شبيث بن ربعى ، يا حجار بن ابجر يا قيس بن الا شعث ، يا زيد بن الحارث الم تكتبوا الى فاقدم علينا فانك انما تقدم على جند مجندة ؟ فقالوا له - لم نفعل - فقال سبحان الله و الله لقد فعلتم -

"হে শাবীস ইবনে রাব্য়ী, হে হাজ্জার ইবনে আবজার, হে কাইস ইবনে আশ্আস্, হে যায়েদ ইবনে হারিস। তোমরা কি আমার নিকট লিখনি যে "আপনি আমাদের এখানে আসুন। নিশ্চয়ই আপনি একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর নিকট আসবেন।" তারা তখন হুসাইন (রাঃ) কে জওয়াব দিল ঃ "আমরা এরূপ করিনি।" হুসাইন (রাঃ) বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শপথ; তোমরা এরূপ করেছ।"

হুসাইন (রাঃ) এর এই আর্তনাদ এবং শীয়াদের এই জওয়াব দ্বারা একথা বুঝা যায় যে তারা তাঁকে পত্র লিখে কুফা আসতে অনুরোধ করেছেন এবং সেনাবাহিনীর সমর্থন পাওয়ার আশা দিয়েছেন। তারপর কারবালা প্রান্তরে তারা তা অস্বীকার করেছেন। আর হুসাইন (রাঃ) কে এভাবে ধোকা দিয়ে শাহাদাতের সম্মুখীন করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) তাঁর تحفۂ اثنا عشریۃ গ্রন্থের ৬৮৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

" خطوط کی ترسیل سے لیکر کارگاہ شہادت کی تاریخ کا مطالعہ کرجائے کہ ہرجگہ شیعہ اپکو گھیر گھار کرکشان کشان اور دھکیلتے ہوئے مقتل تک لے جاتے نظر آئینگے جہاں پہنچاکر وہ خود منہ پھیر کر دشمنوں سے سازش کے دام کھرے کرنے پہنچ گئے آج یہ جتنے چاہیں مرثئے جوڑلیں - روز قیامت بہت قریب ہے انشاء اللہ خون حسین (رض) کے ایک ایک قطرہ کا ان کو حساب دینا ہی ہوگا - کیونکہ قاتلان حسین میں سرفہرست یہی ہیں " -

"(কুফা) থেকে পত্রের পর পত্র পাঠান থেকে নিয়ে শাহাদাতের স্থান পর্যন্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করুন। দেখা যাবে যে সব জায়গায় শীয়ারা তাঁকে

www.pathagar.com

(হুসাইন রাঃ) ঘিরে টানতে টানতে হত্যার স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারা সেখানে তাঁকে পেঁাছিয়ে দিয়ে নিজের। শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রের দাম পাকা করতে গেল। আজ এরা যত ইচ্ছা শোক প্রকাশ করুক। কিয়ামাতের দিন খুবই নিকটে। ইন্‌শা আল্লাহ হুসাইন (রাঃ) এর রক্তের এক একটি ফোঁটার হিসাব তাদেরকে দিতেই হবে। কারণ হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের তালিকায় এরাই প্রথমে আছে।"

এরপর মুখতার সাকাফী ইরাকের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শীয়ারা যায়নুল আবেদীন (রাঃ) কে ছেড়ে মুহাম্মাদ ইবনে হানিফা (রঃ) কে ইমাম মেনে নিয়ে ছিলেন। অথচ মুহাম্মাদ ইবনে হানিফা (রঃ) আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত নন। তবুও মুখতার সাকাফীকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল। অথচ এই মুখতার সাকাফী হাসান (রাঃ) এর পায়ে অস্ত্রাঘাত করেছিল।

তারপর শীয়ারা যায়েদ ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এর সাথে ওয়াদা করে তাঁকে জিহাদে নামিয়ে তাঁর ইমামাত অস্বীকার করেছিলেন এবং তিনি তাদের এই অসহযোগিতা ও ধোকাবাজীর কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত হুসাইন (রাঃ) এর মত শাহাদাতবরণ করেন।

রসূল ও ইমাম সম্পর্কে শীয়া আকীদা

ইমামের প্রতি বিশ্বাস রাখার গুরুত্ব ঃ

শীয়াগণ হযরত আলী (রাঃ) সহ মোট ১২ জনকে আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ও নিষ্পাপ ইমাম বলে বিশ্বাস করেন। এদের ইমামাতের প্রতি ঈমানকে দ্বীন ইসলামের অন্যতম মূলনীতি ও স্তম্ভ হিসেবে শীয়ারা আকীদা রাখেন এবং মুমিন হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত বলে গণ্য করেন। এ সম্পর্কে তাদের মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফার তার عقائد الامامية (আকায়েদুল ইমামিয়া) গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

نعتقد ان الامامة اصل من اصول الدين لا يتم الايمان الا بالاعتقاد بها ـ

"আমরা বিশ্বাস করি যে ইমামাত দ্বীনের মৌলিক নীতিসমূহের একটি। এর প্রতি বিশ্বাস না রাখলে ঈমান পূর্ণ হয় না।"

www.pathagar.com

রসূল ও ইমামের মধ্যে পার্থক্য নেই ঃ

এ ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ

ولعتقد ان الامام كالنبى يجب ان يكون معصوماً من جميع الرذائل و الفواحش ماظهر منها و ما بطن - من سن الطفولة الى الموت عمدا وسهوا كما يجب ان يكون معصوماً من السهو والخطاء والنسيان لان الائمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم فى ذلك حال النبى - والدليل الذى اقتضانا ان نعتقد بعصمة الانبياء هو نفسه يقتضينا ان نعتقد بعصمة الائمة -

"আমরা বিশ্বাস করি যে ইমাম নাবীর মতই শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছাকৃত ও ভুল বশতঃ সমস্ত অনৈতিক, অশ্লীল, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কাজ থেকে মা'সুম (নিষ্পাপ) হওয়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া ওয়াজিব। কারণ ইমামগণ শারীয়াতের হেফাযাতকারী ও তার পরিচালক। এ ব্যাপারে তাদের অবস্থা নাবীর অবস্থার মতই। যে দলীলের জোরে আমরা নাবীদের নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করি সেই দলীলের দাবী অনুযায়ীই আমরা বিনা পার্থক্যে ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করি।"

উক্ত গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

بل نعتقد ان امرهم امر الله تعالى ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه وعدوهم عدوه ولا يجوز الرد عليهم .....

ولهذا نعتقد ان الاحكام الشرعية الالهية لا تستقى الا من نميرهم ولا يصح اخذها الا منهم ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع الى غيرهم ولا يطمئن بينه و بين الله الى انه قد ادى ماعليه من التكاليف الحفروضة الا من طريقهم -

"বরং আমরা বিশ্বাস করি যে তাদের হুকুম আল্লাহর হুকুম, তাদের নিষেধ আল্লাহর নিষেধ। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য, তাদের অবাধ্যতা আল্লাহর অবাধ্যতা। তাদের বন্ধু আল্লাহর বন্ধু এবং তাদের দুশমন আল্লাহর দুশমন। আর তাদের প্রতিবাদ করা জায়েয নয়।

www.pathagar.com

এজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর শারীয়াতের সমস্ত হুকুম তাদের পবিত্র বাণী ব্যতীত পরিতৃপ্ত হয় না। আর তা তারা ছাড়া অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করা ঠিক নয়। তারা ছাড়া অন্যদের নিকট গেলে যে কাল্লাফের দায়িত্ব পালন করা হয় না। তার উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত রয়েছে তা তাদের পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পালন করেছে বলে সে ও আল্লাহর মাঝে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।"

উক্ত গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

ونعتقد ان الامامة كالنبوة لاتكون الا بالنص من الله على لسان رسوله اولسان الامام المنصوب بالنص اذا اراد ان ينص على الامام من بعده وحكمها فى ذلك حكم النبوة بلا فرق -

"আমরা আরও বিশ্বাস করি যে ইমামাত নাবুয়াতের মতই আল্লাহর নির্দেশেই হয়। এটা তার রসুলের বাণী অথবা তার নির্দেশক্রমে নিযুক্ত পরবর্তি ইমামের মুখের বাণীর মাধ্যমেই হয়। আর এ ব্যাপারে ইমামাতের হুকুম ও নাবুয়াতের হুকুম একই। এতে কোন পার্থক্য নেই।'

শীয়াদের ইমামগণের তালিকা ঃ

১। আবুল হাসান আলী ইবনে আবুতালিব (রাঃ)।
(জন্ম ঃ হিজরীপূর্ব ২৩—মৃত্যুঃ ৪০ হিজরী)

২। আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী (রাঃ)।
(জন্ম ঃ হিঃ ২—মৃত্যু ৫০ হিঃ)

৩। আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)।
(জন্ম ঃ হিঃ ৩—মৃতু ৬১ হিঃ)

৪। আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে হোসাইন (যায়নুল আবেদীন) (রাঃ)
(৩৮ হিঃ—৯৫ হিঃ)

৫। আবু জাফার মুহাম্মাদ ইবনে আলী (আল বাকের) (রঃ)
(৫৭ হিঃ—১১৪ হিঃ)

৬। আবু আবদুল্লাহ জাফার ইবনে মুহাম্মাদ, (আস্‌সাদেক) (রঃ)
(৮৩ হিঃ—১৪৮ হিঃ)

৭। আবু ইব্রাহীম মুসা ইবনে জাফার, (আল কাযেম)
(১২৮ হিঃ—১৮৩ হিঃ)

www.pathagar.com

৮। আবুল হাসান আলী ইবনে মুসা। (আর রিদা)
(১৪৮ হিঃ—২০৩ হিঃ)

৯। আবু জা'ফার মুহাম্মদ ইবনে আলী। (আল জাওয়াদ)
(১৯৫ হিঃ—২২০ হিঃ)

১০। আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ। (আল হাদী)
(২১২ হিঃ—২৫৪ হিঃ)

১১। আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী। (আল আস্কারী)
(২৩২ হিঃ—২৬০ হিঃ)

১২। আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান। (আল মেহ্দী)
(২৫৬ হিঃ— ... ...)

(আকায়েদুল ইমামীয়া ঃ ৭৬ পৃষ্ঠা।)

ইমামদের উচ্চতর মর্যাদা ঃ

শীয়াদের মতে তাদের ইমামদের মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তা দ্বারা বুঝা গেল যে ইমামগণই সব কিছুর মাপকাঠি। তাদের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। এজন্যই শীয়া নেতা জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী উক্ত ইমামদেরকে নাবী ও রসুলের উর্ধে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থের ৫২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

فان للامام مقاما محمودا و درجة سامية و خلافة تكوينية تخضع لولا يتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبى مرسل ..... وقد ورد عنهم ان لنا مع الله حالات لايسعها ملك مقرب ولا نبى مرسل - ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام " (الحكومة الاسلامية - صفحه ٥٢ للسيد روح الله الخميني

"ইমামের প্রশংসিত মান ও উচু মর্যাদা রয়েছে। আর তার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক খিলাফাত যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এবং প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য এই বিশ্ব লোকের সমস্ত অনু পরমানু অবনত হয়ে যায়। আর আমাদের মাযহাবের একটা জরুরী বিষয় এই যে, আমাদের ইমামদের এমন মান মর্যাদা রয়েছে যেখানে আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা এবং কোন নাবী রসুলও পেঁছতে পারেন না। .. .. আর ইমামদের (আঃ) থেকে একথা এসেছে যে

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে আমাদের এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা এবং কোন নাবী রসূলও লাভ করতে পারেন না। আর এরূপ মর্যাদা ফাতেমা যাহ্‌রা (আঃ) এর জন্যও বর্তমান রয়েছে।"

জনাব খোমেনী এ বইখানা বেলায়াতে ফাকীহ সম্পর্কে লিখেছেন। এর রচনা কাল হচ্ছে ১৩৮৯ হিজরীর ১০ই জুলকাদা থেকে ১লা জুলহজ্জ পর্যন্ত। এটা ইরানের ওজারাতুল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। আর এই বই ইরানের বিপ্লবের ভিত্তি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই নাবী, রসূল ও ইমামদের সম্পর্কে ইরানী শীয়াদের মূল আকীদা সুস্পষ্টভাবে এ বইতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। তাই মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

হযরত আলী (রাঃ)এর ইমামাত

ইমামীয়া শীয়াদের মতে আলী (রাঃ) কে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফা ও ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সাহাবা (রাঃ) নাকি সে নিযুক্তি উপেক্ষা করে প্রথমে আবু বকর (রাঃ) তারপর উমার (রাঃ) তারপর উসমান (রাঃ) তারপর আলী (রাঃ) কে খলিফা রূপে নির্বাচিত করেছিলেন। শীয়াদের মতে আলী (রাঃ) ই প্রকৃত খলিফা বা ইমাম। তারা আকীদা রাখেন যে আলী (রাঃ) কে তাঁর প্রাপ্য ইমামাত থেকে বঞ্চিত করে তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন খলিফা হয়েছিলেন।

শীয়ারা তাদের এই কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বহু আয়াত ও কতিপয় হাদীসের অর্থ বিকৃত করেছেন। এখানে একটি আয়াত ও একটি হাদীসের অপব্যাখ্যা পেশ করা হল।

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ط و ان لم تفعل

فما بلغت رسالته ط (المائدة : ٦٧)

"হে রসূল, তোমার নিকট তোমার রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল হয়েছে তুমি তা পেঁাছিয়ে দাও। যদি তুমি একাজ না কর তবে তাঁর রিসালাত (মিশন) পেঁাছাওনি (বলে গণ্য করা হবে)।" (মায়েদা—৬৭)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শীয়া মুফাসসির সা'লাবীর তাফসীরে লিখিত আছে যে এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ) এর হাত ধরে বলেছেন :

www.pathagar.com

من كنت مولاه فعلى مولاه وال من والاه عاد من عاداه -

অর্থাৎ "আমি যার বন্ধু আলী তার বন্ধু। যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসে তাকে ভালবাস। আর যে তার সাথে শত্রুতা করে তার সাথে শত্রুতা কর।"

শীয়াদের মতে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের কথা প্রচার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত হাদীসের দ্বারা তাঁর ইমামাতের ঘোষনা দিয়েছেন। কিন্তু হাদীসটিকে আপাততঃ সত্য বলে ধরে নিলেও তাতে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের কথা ঘোষণা করার অর্থ পাওয়া যায় না। অবশ্য আলী (রাঃ) এর প্রতি বিশেষ ভালবাসা রাখা এবং তাঁকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অর্থ বুঝা যায়। কারণ مولى শব্দের অর্থ যে এখানে প্রভু নয় বরং বন্ধু তা এ হাদীসের শেষ দুটি বাক্য وال من والاه عاد من عاداه দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এর পর সা'লাবীর বর্ণনায় আছে যে নাবী (সঃ) "আব্‌তাহ" নামক স্থানে অবস্থান কালে হারেস ইবনে নোমান ফাহরী তাঁর নিকট এসে আলী (রাঃ) নেতৃত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে বলেছেন "আল্লাহর শপথ এটা আল্লাহর হুকুম।" আর হারেস যখন একথা বিশ্বাস না করে চলে গেল, তখন আল্লাহ তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলেন। সেটা তার মাথায় পড়ে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে গেল এবং তাকে মেরে ফেলল।

আল্লামা যাহাবী (রঃ) শীয়া সা'লাবীর তাফসীরের উক্ত বর্ণনাকে তার "মুস্তাকা" গ্রন্থের ৪২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করে মিথ্যা বলে মন্তব্য করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবীদের ঈমান ছিল না বলে শীয়ারা মন্তব্য করেছেন। কারণ শীয়াদের মতে সাহাবীগণ এ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট হাদীস অনুযায়ী আলী (রাঃ) কে মূল ও একমাত্র খলিফা রূপে স্বীকার করেননি। প্রকৃত পক্ষে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শীয়ারা যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা সবই মুসলিম উম্মাতের বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণের মতে ভিত্তিহীন ও মনগড়া। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) 'তাঁর মিনহাজুস সুন্নাত' গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় এ হাদীস সম্পর্কে উক্তরূপ মন্তব্য করেছেন।

এ হাদীসটি মিথ্যা হওয়ার একটি প্রধান কারণ এই যে সা'লাবীর বর্ণনায় একথা আছে যে হারেস ইবনে নোমান আব্‌তাহ্ নামক স্থানে নাবী (সঃ) এর সাথে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। এ কথা বিখ্যাত শীয়া পন্ডিত ইবনে মোতাহার তার 'মিনহাজুল কারামা'তেও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য যে নাবী (সঃ) হাজ্জা-

www.pathagar.com

তুল বিদার পর আব্‌তাহ্‌ নামক স্থানে আগমন করেননি। এ স্থানটি মাক্কার অন্তর্ভূক্ত। তিনি হাজ্জাতুল বিদার পর সোজা মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। শীয়ারা বলেন যে হাজ্জাতুল বিদার পর "গাদীরে খুমে" নাবী (সঃ) উক্ত হাদীস বলেছেন। তাদের একথা অনুযায়ী নাবী (সঃ) এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে।

গাদীরে খুমের উক্ত হাদীস মিথ্যা ও মনগড়া প্রমাণিত হওয়ার পর আলোচ্য আয়াত আলী (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বলে শীয়ারা যে উক্তি করেছেন তা ভিত্তিহীন। তারা হাদীস রচনা করে আলোচ্য আয়াতের অপব্যাখ্যা করছেন।

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনীও তার الحكومة الاسلامية ... গ্রন্থে গাদীরে খুমের মনগড়া হাদীস উল্লেখ করে আলোচ্য আয়াতের অপব্যাখ্যায় শরীক হয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের কথা প্রচার করার ব্যাপারে কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। এতে আল্লাহর সব অহী প্রচার করার হুকুম করা হয়েছে। আর নাবী (সঃ) আল্লাহর সব কথাই প্রচার করে দিয়েছেন। কিন্তু শীয়া সা'লাবী ও অন্য সমস্ত শীয়াদের দাবী এই যে নাবী (সঃ) এ আয়াতের প্রেক্ষিতে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের কথা নাকি গাদীরে খুমে ব্যাপকভাবে প্রচার করে দিয়েছেন এবং তাঁর হাজার হাজার সাহাবী নাকি তা শুনেছেন। কিন্তু কোন সাহাবী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় না। আল্লাহর সব কথা প্রচার করার জন্য নাবী (সঃ) কে এ আয়াতে হুকুম করা হয়েছে এবং তা না করলে রিসালাত পৌঁছানোর কাজ কাজই হয় না বলে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ গরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলী (রাঃ) এর ইমামাতের কথা সাহাবীগণ (রাঃ) গোপন রাখতে পারেন না। এরূপ কোন কথা হয়ে থাকলে তা তারা প্রথম খলীফা নির্বাচনের সময়েই বলতেন। কিন্তু কেউ তা বলেননি। এমনকি স্বয়ং আলী (রাঃ)ও এ আয়াত ও এ হাদীস পেশ করেননি। তিনি চতুর্থ খলীফা হওয়ার পর মুয়াবিয়া (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) এর সাথে সংঘর্ষেও কামিয়াব হন। তাই তখন তথাকথিত তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে তিনি নিজের ইমামাতের কথা প্রকাশ করেননি বলে যুক্তি পেশ করলে তা টিকেনা। তাঁর বহু সমর্থক গণও তখন এ ব্যাপারে চুপ ছিলেন এমতাবস্থায় মনগড়া হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের অর্থ বিকৃত করার অপচেষ্টার প্রমাণই পাওয়া যায়।

শীয়ারা ছাড়া গোটা মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতভাবে এমত পোষণ করে যে এ আয়াত আলী (রাঃ) এর সম্পর্কে নাযিল হয়নি। গাদীরে খুমের দিনে

www.pathagar.com

এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলেও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে আল্লামা আলূসী (রঃ) রূহুল মায়ানীতে এবং আল্লামা শাওকানী ফাতহুল কাদীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন যে ইবনে মারদবিয়া ও যিয়া 'মুখতার' গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

"ইবনে আব্বাস বলেন যে রসূলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার উপর সবচেয়ে বেশী কঠোর হিসেবে কোন্ আয়াত নাযিল হয়েছে ? তিনি বললেন; "আমি হাজ্জের সময় যখন মিনায় ছিলাম তখন আরবের মুশরিকগণ ও অন্যান্য লোকেরা আমার বিরুদ্ধে সমবেত হল। এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট এসে يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الخ নাযিল করে গেলেন। আমি তখন আকাবার নিকট দাঁড়িয়ে লোকদেরকে ডেকে বললাম ঃ কে আমার রবের রেসালাত পেঁছাবার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে ? তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে হে লোকেরা ! তোমরা বল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আর আমি আল্লাহর রসূল।" তাহলে তোমরা কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে। আর তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তাফসীরে ইমাম আহমাদ (রঃ) এর এক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন ঃ 'রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তার উটনীর উপর সওয়ার ছিলেন এবং আমি তার লাগাম ধরে ছিলাম তখন সম্পূর্ণ সূরা মায়েদা একসাথে নাযিল হয়েছে।'

এসব বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতটি হাজ্জাতুল বিদার অনেক পূর্বেই ৭ম হিজরীর প্রথমভাগে নাযিল হয়েছে। সূরা মায়েদার সবগুলো আয়াত এক সংগে নাযিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি পৃথকভাবে নাযিল হয়নি। এ আয়াত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের নিকট কালেমার দাওয়াতও পেঁছিয়ে দিয়েছেন। কাজেই গাদীরে খুমের সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্কই নেই। কারণ ৮ই জুলহাজ্জাহ্, হাজ্জাতুল বিদার দিন। আর শীয়াদের মতে গাদীরে খুমের দিন হচ্ছে ১৮ই জুলহাজ্জাহ্। সেদিন তারা ঈদও পালন করে থাকেন।

হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এর ইমামাত

শীয়ারা বিশ্বাস করেন যে আলী (রাঃ) প্রকৃত ইমাম এবং তিনি পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু একথা সত্য নয়। কারণ তিনি কাকেও পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করেননি। এ সম্পর্কে الهد ايـة والنـهايـة ৭ম খণ্ডের ৩২৪ ও ৩২৫ পৃষ্ঠা থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর বক্তব্য পেশ করা হল।

www.pathagar.com

"فقالوا يا امير المؤمنين الا تستخلف ؟ فقال لا و لكن اتركم كما تركم رسول الله صلعم" -

"উপস্থিত ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করলেন; হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি আপনার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করবেন না? তিনি বললেন, "না—তবে আমি তোমাদেরকে সেভাবে ছেড়ে যাচ্ছি যেভাবে তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ছেড়ে গিয়েছেন।"

হযরত আলী (রাঃ) এর একথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে তিনি হাসান (রাঃ) কে পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করেননি। এরপর হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) কে ইমাম নিযুক্ত করেননি। তারপর হুসাইন (রাঃ) তো কারবালায় শাহাদাত বরণ করার পূর্ব মুহূর্তে কাউকে পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করার সুযোগই পাননি। কাজেই শীয়াদের ইমাম নিযুক্তির আকীদার কোন ভিত্তি ও প্রমাণ নেই।

শীয়াদের অদৃশ্য ইমাম

ইস্না আশারিয়া শীয়াদের ১১ নং ইমাম আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী আল আসকারী (রঃ) ২৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে ২৬০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার কোন সন্তান ছিল না। তাই তার ভাই জা'ফার (রঃ) তার কাফন ও দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন এবং তার কোন সন্তান না থাকার ভিত্তিতে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করেন। আর একাজ তার পরিবারবর্গকে এবং অন্যান্য সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও অনুসারীদেরকে অবগত করেই সম্পন্ন করেন। এভাবে অনেক দিন চলে গেল। বহুদিন পর্যন্ত লোকেরা এটাই জানত যে হাসান আসকারীর (রঃ) কোন সন্তান ছিল না। এরপর নতুন এক ধারণা আবিষ্কার করা হল। সেটা হচ্ছে অদৃশ্য ইমামের আকীদা। শীয়াদের পক্ষ থেকে একথার প্রচার চলতে লাগল যে হাসান আসকারী (রঃ) এর ইন্তেকালের ৫ বছর পূর্বে তার এক পুত্র সন্তান হয়েছিল। সে সন্তান নাকি সামরায় তার বাড়ীর মাটির নীচে অবস্থিত এক কক্ষে আত্ম-গোপন করে জীবিত অবস্থায় আছে। এ আকীদার একজন প্রধান রচনাকারী হচ্ছেন বাণী নামীর গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনে নোসাইর। তিনি এ আকীদার মাধ্যমে উক্ত কল্পিত অদৃশ্য ইমামের প্রতিনিধি (باب) হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাই তিনি শেষে আর একটি নতুন আকীদা রচনা করে নিজের স্বতন্ত্র শীয়া গ্রুপ তৈরী করলেন। এটাই পরবর্তী যুগে 'নোসাইরিয়া' নামে অভিহিত হয়েছে। এসব তথ্য الشيعة গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

www.pathagar.com

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী সহ সমস্ত শীয়ারা বিশ্বাস করেন যে তাদের ১২ নং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি নাকি অদৃশ্য হয়েছেন। জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী তার আলহুকুমাতুল ইসলামীয়ার ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"আমাদের ইমাম মেহ্দী অদৃশ্য হওয়ার পর এক হাজার বছরের বেশী চলে গিয়েছে।" জনাব খোমেনী উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে অদৃশ্য ইমামের কথা উল্লেখ করে তার সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে শীয়া নওজোয়ানদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে শীয়াদের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দিস্ কোলাইনীর "আলকাফী" ১ম খণ্ডের ৩৩৬ ও ৩৩৭ পৃষ্ঠায় মুসা ইবনে জা'ফার, আবু আবদুল্লাহ জা'ফার ও যারারাহ্ থেকে অনেক কথা বর্ণিত আছে। এসব বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের ইমামের অদৃশ্য হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষ জাতিকে পরীক্ষা করেন আর তার সম্পর্কে বলা হবে যে তিনি মরে গিয়েছেন, অথবা নিহত হয়েছেন অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি ভয়ে অদৃশ্য হয়েছেন বলেও যারারাহ এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শীয়াদের বিশ্বস্ত গ্রন্থ 'ইলালুশ্ শারাএয়ে' (علل الشر ائع) এর ২৪৩ পৃষ্ঠায় আছে যে রসুলুল্লাহ (সঃ) (নাকি) বলেছেন যে উক্ত ছেলেটি অদৃশ্য হওয়া জরুরী ছিল। কারণ সে হত্যার ভয় করত। শীয়ারা এ ধারণাও পোষণ করেন যে রসুলুল্লাহ (সঃ) নাকি বলেছেন ঃ "আমার সন্তান ইমাম মেহ্দীকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে আমাকেই অস্বীকার করে।"

(ইকমালুদ্দীন ৩৯০ পৃষ্ঠা)

আলকাফী ১ম খণ্ডের ৩৩৫ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই অদৃশ্য ইমাম সম্পর্কে বহু আজগুবি, উদ্ভট ও হাস্যকর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

শীয়ারা বিশ্বাস করেন যে তাদের অদৃশ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী শেষ যুগে দুনিয়ায় মেহ্দী হিসেবে ফিরে এসে ন্যায় বিচার কায়েম করবেন। তখন সমস্ত মুসলিম শাসকবৃন্দকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন। আর উক্ত ইমাম মেহ্দী ঐ সব যালিমদেরকে শাস্তি দিবেন। এ সব কথা আকায়েদুল ইমামীয়া গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

এ কথা তো মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে যে ইমাম মেহ্দী দুনিয়াতে এসে আবার خلافة على منهاج النبوة কায়েম করে ন্যায় বিচার জারী করবেন। আর এ ব্যাপারে সঠিক হাদীসও আছে। কিন্তু সেই ইমাম মেহ্দী যে শীয়াদের অদৃশ্য ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসকারী হবেন তার কোন প্রমাণ নেই।

www.pathagar.com

শীয়া ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র

ইসলামী ফিক্‌হ্‌

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের জন্য যে বাস্তব নিয়ম পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে সেটাই হচ্ছে ফিক্‌হ্‌। এতে এবাদাত, লেন-দেন, অর্থ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, পারিবারিক বিধান ইত্যাদি সবই রয়েছে। তাই এটাই হচ্ছে ইসলামী শারীয়াতের বাস্তব বিধান। মুসলিম উম্মাহ ফিকহের যে বিরাট ও মূল্যবান ভান্ডারের মালিক তার তুলনা কোথাও নেই। এই ফিকহের মূলনীতি গুলো (اصول فقه) অকাট্য ও চিরন্তন। মুসলিম উম্মাতের ইসলামী ফিকহের শ্রেষ্ঠতম মুজতাহিদ ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)। এদের অসাধারণ জ্ঞান, তাকওয়া, মেহনাত, ত্যাগ-তিতীক্ষা, গবেষণা এবং আল্লাহ ও রসূলের (সঃ) সাথে গভীর সম্পর্ক মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছে যে ইসলামী ফিকহের ক্ষেত্রে এই মহাপুরুষদের নামে ৪টি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে। এই চারটির বাইরেও ফিকহের মাযহাব আছে। মোট কথা এসব মাযহাবই কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে মুসলিম উম্মাতের নিকট গৃহীত। মুসলিম উম্মাতের মধ্যে শত শত ফাকীহ হয়েছেন। তাদের ও উক্ত চার মাযহাবের মধ্যে ইসলামের কোন মৌলিক অকীদা, নীতি ও বিষয়ে মতভেদ নেই। খুঁটিনাটি ব্যাপারে যে সব মতভেদ রয়েছে তাও কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর সে মতভেদ মুসলিম উম্মাতের জন্য আল্লাহর বিশেষ রাহমাত।

শীয়া ফিকহের পরিচয়

শীয়া ফিক্‌হ্‌ মুসলিম উম্মাতের গৃহীত ইসলামী ফিকহ থেকে স্বতন্ত্র। শীয়া ফিক্‌হ্‌ প্রধানতঃ শীয়াদের ইমামগণের হাদীস অনুযায়ী রচিত হয়েছে বলে দাবী করা হয়। শীয়া ইসনা আশারিয়াগণ (বার ইমাম পন্থী) হযরত জা'ফার সাদেক (রঃ) এর মত অনুযায়ী রচিত জা'ফারী ফিকহকে গ্রহণ করেছেন বলে দাবী করেন। ইরানের বর্তমান সংবিধানেও জা'ফারী ফিকহকে সে দেশের আইন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত জা'ফার সাদেক (রঃ) মুসলিম উম্মাতের একজন বিশিষ্ট ভক্তি-ভাজন মহাপুরুষ। শীয়াগণ তাঁর নামে এক ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র রচনা করে নিয়েছে। যে কথা ও কাজ তাঁর থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তা সবই তিনি বলেছেন ও করেছেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়। হাদীস রচনা করা যেহেতু শীয়াদের স্বভাব, কাজেই মনগড়া ভিত্তিতে তাদের ফিক্‌হ্‌ রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। শীয়া ফিক্‌হ্‌ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে তার দুটি মূলনীতি পেশ করা হল :—

শীয়া ফিক্‌হের একটি মূলনীতি :

শীয়া ফিক্‌হের একটি মূলনীতি এই যে মুসলিম উম্মাতের গৃহীত ইসলামী ফিক্‌হ ও মুসলিম ফাকীহগণের কোন কথা গ্রহণ করা হারাম, কুফ্‌র্‌ ও শয়তানী কাজ। এর দলীল স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতকে তার অর্থ বিকৃত করে পেশ করা হয়েছে :

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به - (النساء)

অর্থাৎ "তারা 'তাগুত' (ইসলাম বিরোধী শক্তি) এর নিকট থেকে তাদের ফায়সালা নিতে চায়। অথচ তাদেরকে তার বিরোধীতা করার হুকুম করা হয়েছে।"

এ আয়াতে 'তাগুত' শব্দের অর্থ শীয়াদের নিকট মুসলিম উম্মাতের ফক্‌ীহ্‌, ইসলামী বিচারালয়ের বিচারক ও মুসলিম শাসকবৃন্দ। অন্য কথায় এরা সব শীয়াদের মতে তাগুত বা শয়তান ও ইসলাম বিরোধী। শীয়াদের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ আল কাফীতে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব কোলাইনী এ সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদেকের (রঃ) এক হাদীস বর্ণনা করেছেন। জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তার বেলায়েতে ফকীহের গ্রন্থ الحكومة الاسلامية এর ৭৪ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

"আমর ইবনে হানযালা বললেন যে আমি আবু আবদুল্লাহকে (ইমাম জাফর সাদেক) আমাদের দুজন সাথীর মধ্যকার একটি বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বিরোধটি ছিল কোন ঋণ অথবা মীরাস সম্পর্কে। তারা দুজনে বিষয়টির ফায়সালার জন্য সুলতান এবং বিচারকদের নিকট তা পেশ করল। এরূপ করা কি হালাল? তিনি (ইমাম জাফর সাদেক)

www.pathagar.com

বললেনঃ 'যে ব্যক্তি কোন হক বা বাতিলের ফায়সালা তাদের নিকট চায় সে তাগুতের নিকট ফায়সালা চায়। আর তার জন্য যে ফায়সালা দেয়া হয় তা গ্রহণ করা হারাম, যদিও তা তার জন্য প্রমাণিত হক হোক না কেন। কারণ সে তাগুতের ফায়সালা অনুযায়ী গ্রহণ করল। আর আল্লাহ এরূপ ফায়সালাকে অমান্য করার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به -

আমি বললাম ঃ 'তাহলে ঐ দু ব্যক্তি কী করবে? তিনি (জাফর সাদেক) (রঃ) বললেন ঃ তারা দেখবে যে তোমাদের কে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছে এবং আমাদের হালাল ও হারামের দিকে নযর দিয়ে আমাদের নির্দেশাবলী জেনে নিয়েছে, এতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কারণ আমি ওটাকে তোমাদের উপর হুকুমদাতা ঠিক করেছি।"

শীয়াদের এই হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন কোলাইনী। ৩২৯ হিজরীতে তার মৃত্যু হয়েছে। আর ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) এর জন্ম হয়েছে ৮৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু হয়েছে ১৪৮ হিজরীতে। যে ওমর ইবনে হান্যালা থেকে কোলাইনী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি জাফর সাদেকের সাথে সাক্ষাত করেছেন বলে ধরে নিলেও ওমর ইবনে হান্যালার সাথে কোলাইনীর সাক্ষাত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। কারণ জাফর সাদেকের মৃত্যু সাল ১৪৮ হিজরী থেকে কোলাইনীর মৃত্যু সাল ৩২৯ হিজরী পর্যন্ত ১৮১ বছর হয়। আর কোলাইনী এত বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন না। উমর ইবনে হানযালার সাক্ষাত জাফর সাদেকের (রঃ) সাথে হয়েছে বলে ধরে নিলেও তার সাথে কোলাইনীর সাক্ষাত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তিনি এতদিন জীবিত ছিলেন না। এমতাবস্থায় কোলাইনীর বর্ণনা ভিত্তিহীন হওয়াই স্বাভাবিক।

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী উক্ত ভিত্তিহীন হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

الامام عليه السلام نفسه ينهى عن الرجوع الى السلاطين و قضاتهم و يعتبر الرجوع اليهم رجوعا الى الطاغوت -

(الحكومة الاسلامية - صفحة ٨٣)

"ইমাম (আঃ) নিজেই সুলতানগণ ও তাদের (নিযুক্ত) বিচারকদের নিকট (ফায়সালার জন্য) যাওয়া নিষেধ করেছেন এবং তাদের নিকট যাওয়া কে তিনি তাগুতের (শয়তানের) নিকট যাওয়া বলে গণ্য করেছেন।"

(আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া ৭৪ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী খিলাফাতে রাশেদার যুগের ইসলামী আদালতের বিচারক কাযী শোরাইহ্‌কেও গালি দিয়েছেন এবং তাঁর ভূমিকাকে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফাতের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

(আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া ৭৫ পৃষ্ঠা)

কোলাইনী ও জনাব খোমেনীর উক্তি থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সব শীয়ারা একই সুরে ইসলামী ফিক্‌হ্‌ ও মুসলিম ফকীহগণের ইজ্‌তেহাদের বিরোধীতা করা তাদের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ তাদের নিকট তা সবই ইসলাম বিরোধী। প্রকৃতপক্ষে শীয়ারা মুসলিম উম্মাতের বিরাট সম্পদ ইসলামী ফিক্‌হ্‌ থেকে নিজেরা যেমন বঞ্চিত হয়েছেন তেমনি অন্যদেরকেও বঞ্চিত করতে চান।

হানাফী ফিক্‌হ্‌ ও ইমাম জাফর সাদেক (রঃ)

আমরা দেখতে পাই যে ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) ৮৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীতে মাদীনায় ইন্তেকাল করেন। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করে ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এ দু'জনই বাণী উমাইয়া ও বাণী আব্বাসীয়াদের যুগ দেখেছেন। তাঁরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের যুগও দেখেছেন। উভয়ের পারস্পরিক সাক্ষাত আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ও হয়েছে। জাফর সাদেক (রঃ) আবু হানীফার (রঃ) উস্তাদও ছিলেন। সে সময় ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর ফিকহী মাযহাব অনুযায়ী মুসলিম রাষ্ট্রের আদালাতে কাযীগণ বিচার করতেন। ইমাম আবু হানীফার যুগে ইমাম মালেক (৯৫ হিঃ—১৭৯ হিঃ) মদীনায় বিখ্যাত ফকীহ হিসেবে গণ্য ছিলেন। কোন মুসলিম সুলতানের নিকট কেউ তখন শরয়ী ফায়সালা গ্রহণের জন্য যেতনা। কোন সুলতান উক্ত ফকীহগণের ইসলামী ফিক্‌হের পরিবর্তে অন্য কিছু চালু করার সাহস পেতনা, কারণ মুসলিম জনগণ উক্ত ফকীহগণের পক্ষে ছিল। এসব ফকীহগণ এমন ছিলেন যে তদানিন্তন সরকার তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে, অত্যাচার উৎপীড়ন করে এবং ধন সম্পত্তি ও বড় বড় পদ পেশ করেও তাদেরকে বিন্দুমাত্র আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। এমতাবস্থায় ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) তখনকার কাযীদের ফিকহী ফায়সালাকে তাগুতী ফায়সালা বলতে পারেন না এবং তা বলেন নি। এরূপ কোন মন্তব্য তিনি প্রকাশ করলে তা ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) অবশ্যই জানতেন এবং তা নিয়ে আলোচনাও হত। এরপর ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর প্রধান ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ১৬৬

www.pathagar.com

হিজরীতে খলীফা আল মেহ্দীর সময় বাগদাদের কাযী নিযুক্ত হন এবং পরে গোটা আব্বাসীয়া খিলাফাতের প্রধান বিচারপতি ও আইন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন তো তার কর্তৃত্বাধীনে গোটা মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বস্তরে হানাফী ফিক্হ্ চালু হয়ে যায় এবং সমস্ত বিচারালয়ে উক্ত ফিক্হ্ অনুযায়ীই কাযীগণ বিচার করতেন। কাযীদের সে সব বিচারের রায় ও ফায়সালা স্বয়ং ইমাম আবু ইউসুফের তত্ত্বাবধানে হত। কাজেই সেগুলো মুসলিম উম্মাতের ইসলামী ফিক্হের বিরাট ও মূল্যবান সম্পদ।

এখানে প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ইমাম জাফর সাদেকের (রঃ) সময়ই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) الفقه الاكبر গ্রন্থ লিখে তাতে খোলাফায়ে রাশেদীনকে (রাঃ) মুসলিম উম্মাতের গৃহীত তরতীব অনুযায়ী পেশ করে সকলকেই সত্যপন্থী বলে উল্লেখ করেছেন। (মুল্লা আলী কারী (রঃ) এর شرح الفقه الاكبر গ্রন্থের ৭৪—৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) এর নিকট ইমাম আবু হানীফার এ মন্তব্য না পৌঁছার কোন কারণ ছিল না। তিনি এ মন্তব্যের কোন বিরোধীতা করলে তা নিশ্চয়ই ইতিহাসে পাওয়া যেত। প্রকৃত পক্ষে ইমাম জাফর সাদেকও (রঃ) উক্ত মতই পোষণ করতেন। নতুবা তিনি ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কে এ ব্যাপারে নিজের বক্তব্য বলতেন। শীয়ারা হয়ত বলতে পারেন যে তিনি তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে নিজের ইমামাত যেমন প্রকাশ করেন নি তেমনি আবু হানীফা (রঃ) এর মন্তব্যের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলেননি। কিন্তু একথা ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। কারণ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ইমাম জাফর সাদেকের (রঃ) ছাত্র ছিলেন। তিনি কোন সরকারী লোক ছিলেন না এবং কোন পরাক্রমশালী লোকও ছিলেন না। কাজেই তাঁকে ভয় করে তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করারও কোন কারণ ছিলনা।

শীয়া ফিক্হের আর একটি নীতি

ফিক্হের ব্যাপারে শীয়াদের আর একটি নীতি এই যে কোন বিষয়ে দুজন ফকীহের রায়ে দুরকমের হাদীস পাওয়া গেলে তার যেটি মুসলিম উম্মাতের রায়ের বিপরীত সেটা গ্রহণযোগ্য। আর যেটি তার সাথে মিলে যায় সেটা পরিত্যাজ্য। আর দুটি যদি দুজনের রায়ের সাথে মিলে যায়, তবে আহলে সুন্নাতের রায়ের নিকটবর্তী হাদীসটি ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি দুটিই আহলে সুন্নাতের রায়ের সাথে মিলে যায়, তাহলে বিষয়টি সন্দেহজনক। কাজেই তখন ইমামের সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

www.pathagar.com

প্রথম নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে কোলাইনীর যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা জনাব খোমেনীও তার বইতে পেশ করে মুসলিম কাযীদের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত হাদীসের বাকী অংশটুকু পেশ করেননি। এ অংশ শীয়া তুসীর 'তাহযীর' গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশেই শীয়া ফিকহের আলোচ্য নীতি পাওয়া যায়। উক্ত অংশটুকু দীর্ঘ হলেও সকলের অবগতির জন্য মূল ভাষায় এখানে পেশ করা হল।

قلت جعلت فداك ارأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم باى الخبرين يؤخذ ؟ قال ماخالف العامة ففيه الرشاد - قلت جعلني الله فداك - فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال ينظر ماليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويأخذ بالاخر - قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات -

"আমি (উমর ইবনে হানযালা) বললামঃ আমি আপনার (জাফর সাদেক) জন্য উৎসর্গীকৃত। আচ্ছা যদি দুজন ফকীহ কিতাব ও সুন্নাত থেকে কোন বিষয়ের হুকুম জানতে পারেন, আর যদি আমরা দুটি খবরের কোন একটিকে আম লোকদের (আহলে সুন্নাত) (রায়ের) অনুরূপ পাই এবং আর একটিকে তাদের (রায়ের) বিপরীত পাই, তাহলে কোনটি গ্রহণ করতে হবে? তিনি (জাফার সাদেক রঃ) বললেনঃ 'যেটা আম লোকদের বিপরীত সেটাতেই সত্য রয়েছে'। আমি বললামঃ আমাকে আল্লাহ আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আচ্ছা যদি দুটি খবরই দুজনের রায়ের সাথে মিলে যায়। তবে কি করতে হবে? তিনি বললেনঃ 'দেখতে হবে যে কোন্‌টা তাদের (আহলে সুন্নাত) শাসক ও কাযীদের (রায়ের) দিকে' বেশী 'নিকটবর্তী, সেটা ত্যাগ করে অপরটি গ্রহণ করতে হবে।' আমি বললামঃ যদি তাদের শাসকবৃন্দ দুটি খবরের সাথে একমত হয়, তবে কি হবে? তিনি বললেনঃ 'যখন এরূপ হবে তখন তুমি তোমার ইমামের সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কারণ সন্দেহ-জনক বিষয়ে উকুফ (কোন কিছু গ্রহণ না করা) ধ্বংসের মধ্যে পড়ার চেয়ে উত্তম।"

www.pathagar.com

শীয়া ফিক্‌হের সব নীতি বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। যে দুটি নীতি এখানে উল্লেখ করা হল, তা দ্বারাই শীয়াদের জ্ঞান চর্চার রহস্য বুঝা যায়। তারা মুসলিম উম্মাতের বিরোধীতা করা অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ফিক্‌হের ক্ষেত্রেও মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা কোলাইনীর মত মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণিত উক্তিকে শ্রদ্ধেয় ইমাম জাফর সাদেকের (রঃ) বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তাঁকে তারা মুসলিম উম্মাতের বিরোধী দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ইমাম জাফর সাদেক (রঃ) তাদের এসব মিথ্যা কথা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

শীয়া ফিক্‌হের উৎস ঃ

শীয়া ফিক্‌হের উৎস সমূহের মধ্যে একটি বিশেষ উৎস হচ্ছে তাদের অদৃশ্য ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারীর (জন্ম ২৫৬ হিজরী) তাওকী সমূহ (নির্দেশ ও বাণী)। এটাকে توقيعات الرقاع বলা হয়। এর গ্রন্থকারকে শীয়ারা সদুক (صدوق) নাম দিয়েছেন। ব্যাপারটা হল এই যে শীয়ারা বিশ্বাস করেন যে তাদের ১২ নং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী ৯ কিংবা ৫ বৎসর বয়সে ২৬০ হিজরীতে অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁর সাথে ৪ জন শীয়া ব্যক্তির গোপন সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। তারা হচ্ছেন উস্‌মান ইবনে সাঈদ, তার পুত্র মুহাম্মাদ সনবেখতি ও সুমরী। এভাবে ৭০ বছর পর্যন্ত অদৃশ্য ইমামের সাথে এদের গোপন যোগাযোগ চলেছিল। সুমরীর মৃত্যুর সাথে সাথে এ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ সময় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নকারীরা তাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে রাতে কোন গাছের গর্তে রেখে তাদের ইমামের ধ্যান করত। আর উক্ত চারজন তাদের ইমামের নিকট থেকে এজেন্ট হিসেবে সে প্রশ্নগুলোর জওয়াব নিয়ে এসে প্রশ্নকারীদেরকে দিত। এটাই হচ্ছে তাদের রিকা' (رقاع) এর কাহিনী। رقاع অর্থ খন্ড সমূহ। খুব সম্ভব খন্ড খন্ড প্রশ্নপত্র রেখে তার জওয়াব নেয়া হত। তাই এই প্রক্রিয়াকে রিকা' (رقاع) বলা হয়। অদৃশ্য ইমামের এই বাণী ও নির্দেশকে توقيعات তাওকীয়াত বলা হয়।

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনীও এই রিকা' এর হাদীস থেকে অদৃশ্য ইমামের নির্দেশাবলীকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থের ৭৬ পৃষ্ঠায় বেলায়েতে ফাকীহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"الرواية الثالثة توقيع صدر عن الامام الثانى عشر القائم المهدى عليه السلام عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت على - فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام" -

"তৃতীয় বর্ণনা হচ্ছে সেই নির্দেশ বা সেই ১২ নং ইমামের কাছ থেকে এসেছে যিনি ইমাম মেহদী (আঃ) রূপে দন্ডায়মান। ইসহাক ইবনে ইয়াকুব থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনে উস্‌মান উমরীর নিকট চাইলাম যে তিনি যেন আমার সেই পত্রটা আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেন যাতে আমি এমন কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যা আমার নিকট খুব জটিল। তখন আমাদের যুগ নেতা আঃ (মেহদী) এর দস্তখতসহ তার বাণী এসে পড়ল।"

এখানে উল্লেখিত মুহাম্মাদ ইবনে উস্‌মান সেই চারজনের একজন যারা শীয়াদের অদৃশ্য ইমামের সাথে গোপন যোগাযোগ রাখতেন। তাই তার কাছে ইসহাক ইবনে ইয়াকুব তার লিখিত বিষয়গুলোর উত্তর চেয়েছেন। আর তখন অদৃশ্য ইমামের উত্তর এসে পড়েছে।

এই ধরনের আজগুবি কথা ও কাহিনীর ভিত্তিতে যারা তাদের দ্বীনী বিষয়সমূহের সমাধান বের করেন এবং দ্বীনী আদেশ ও নিষেধ, হারাম ও হালাল ইত্যাদি নির্ণয় করেন তাদের ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র কতখানি সত্য তা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু শীয়াদের নিকট এইসব উদ্ভট ও ভিত্তিহীন কাহিনী হচ্ছে সবচেয়ে বিশ্বস্ত দলীল। আর এসবের প্রণেতাকে তারা সদুক (صدوق) বা খুব সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

শীয়া ফিক্‌হের নমুনা ঃ

শীয়া ফিক্‌হের উল্লেখিত মূলনীতি ও উৎসের ভিত্তিতে যে জাফরী ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্র রচিত হয়েছে তার নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি মাসায়েল পেশ করা হল। এগুলো জনাব খোমেনীর যুবদাতুল আহ্‌কাম (زبدة الاحكام) ও তাহরীরুল অসীলা (تحرير الوسيلة)' নাসীরুদ্দীন তুসীর নেহায়া এবং শীয়া মুজতাহিদ আবদুল হুসাইন শরফুদ্দীনের 'মাসায়েলে ফিকহিয়া' (مسائل فقهية) গ্রন্থে লিখিত আছে।

www.pathagar.com

(১) অযুর মধ্যে পা ধোয়ার পরিবর্তে পা মাসেহ্ করা ওয়াজিব। পায়ের পাতার উচু হাড় পর্যন্ত মাসেহ্ করলেই চলবে। এক্ষেত্রে পায়ের গ্রন্থের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। (যুবদাতুল আহকাম ১৪ পৃষ্ঠা)

(২) জানাবাতের ফরয গোসল ব্যতীত জানাযার নামায আদায় করা জায়েয। (যুবদাতুল আহকাম ২৩ পৃষ্ঠা, তাহরীরুল অসীলা ৬৬ পৃষ্ঠা)

(৩) নিম্নোক্ত চারটি সূরা জানাবাতের গোসল ব্যতীত পড়া হারাম। সূরা আলাক, সূরা নাজ্‌ম্‌, সূরা আলিফ লাম তানযীল, সূরা হা—মীম সাজদা। বাকী কুরআন জানাবাতের অবস্থায় পড়া জায়েয।

(যুবদাতুল আহকাম ২৩ পৃষ্ঠা)

(৪) মৃত ব্যক্তির কপাল, দুহাত, দুপা ও দুহাঁটুতে ইমাম হুসাইনের (রাঃ) কবরের মাটি মিশ্রিত কর্পূর লাগান ওয়াজিব। একে হুনুত্ বলা হয়। (যুবদাতুল আহকাম ৪০ পৃষ্ঠা)

(৫) মৃত ব্যক্তির সাথে গাছের দুটি তাজা ডাল দেয়া সুন্নাতে মোআক্কাদা। (যুবদাতুল আহ্কাম ৪০ পৃষ্ঠা

(৬) বছরের প্রথম দিনে (নওরোজ) গোসল করা মোস্তাহাব।

(যুবদাতুল আহকাম ৪৫ পৃষ্ঠা)

(৭) যোহ্‌র ও আসরের সময় হচ্ছে সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। আর মাগরিব ও এশার সময় হচ্ছে মাগরিব থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। (যুবদাতুল আহকাম ৬০ পৃষ্ঠা)

(৮) আলী (রাঃ) এর কবর বরাবর নামায আদায় করা জায়েয।

হুসাইন (রাঃ) এর কবরের মাটির উপর সাজদা করা মুস্তাহাব। কারণ তা অন্তরের ৭টি পর্দা দূর করে দেয় এবং সাত যমীন পর্যন্ত আলোকিত করে।

(যুবদাতুল আহকাম ৬৬ পৃষ্ঠা)

(৯) যার উপর সাজদা করা জায়েয আছে তা যদি কোন ব্যক্তির নিকট না থাকে অথবা তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করার ওজর বশতঃ তার (হুসাইন (রাঃ) এর কবরের মাটি) উপর সাজদা করা সম্ভব না হয়, তাহলে কাপড় অথবা কাতানের উপর সাজদা করবে।

(যুবদাতুল আহকাম ৬৭ পৃষ্ঠা)

(১০) নামাযে ইহরামের তাকবীরের পরে বা আগে আরও ৬টি তাকবীর পড়া মুস্তাহাব। (যুবদাতুল আহকাম ৭১ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

(১১) 'ফরয নামাযে' 'আযায়েমের সূরা' অর্থাৎ সূরা আলাক সূরা নাজ্‌ম, সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল, ও সূরা হা মীম সাজদা পড়া জায়েয নয়। (যুব্‌দাতুল আহকাম ৭৩ পৃষ্ঠা)

(১২) এক হাতের উপর আর একহাত রেখে তাহরীমা বেঁধে নামায আদায় করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। তবে তাকিয়্যাহ অবলম্বন করলে দোষ নেই। (যুব্‌দাতুল আহকাম ৮১ পৃষ্ঠা)

(১৩) নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতেহার পরে 'আমীন' বললে নামায বাতিল হয়ে যায়। (যুব্‌দাতুল আহকাম ৮২ পৃষ্ঠা)

(১৪) ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার নামায ইমাম (আঃ) এর উপস্থিতিতে ওয়াজিব। আর তার অদৃশ্য হওয়ার যুগে উক্ত নামায মুস্তাহাব। এ যুগে ব্যক্তিগতভাবে এ নামায আদায় করা বেশী সাবধানতা।

(যুবদাতুল আহকাম ৯৭ পৃষ্ঠা, তাহরীরুল অসীলা ৬৯ পৃষ্ঠা)

(১৫) জুমুয়ার নামায ও যোহরের নামাযের যে কোন একটি আদায় করা ওয়াজিব। ইচ্ছা করলে জুমুয়ার নামায আদায় করা যায়, আবার ইচ্ছা করলে যোহরের নামায আদায় করা যায়। তবে জুমুয়া আদায় করা ভাল। আর যোহরের নামায আদায় করা বেশী সাবধানতা।

(যুব্‌দাতুল আহকাম ১১১ পৃষ্ঠা)

(১৬) খুমুস্‌ (خمس) ৬ ভাগে বণ্টন করতে হবে। তার মধ্যে একভাগ আল্লাহর, একভাগ নাবী (সঃ) এর এবং একভাগ ইমাম আঃ (আলী রাঃ) এর জন্য। আর এই তিনটি ভাগ বর্তমানে হুকুম কর্তার (রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলের) জন্য। (যুব্‌দাতুল আহকাম ১৫৮ পৃষ্ঠা)

(১৭) নিজ স্ত্রীর সাথে তার আপন ভাতিজী ও আপন ভাগ্নীকে বিয়ে করা তাদের অনুমতিক্রমে জায়েয এবং নিজ স্ত্রীর সাথে তার আপন খালা ও ফুফুকে বিয়ে করা জায়েয।

(যুব্‌দাতুল আহকাম ২৪৫ পৃষ্ঠা, তাহ্‌রীরুল অসীলা ২৭৯ পৃষ্ঠা)

(১৮) স্ত্রীর সাথে তার গুহ্যদ্বার দিয়ে রতিক্রীয়া করা জায়েয।

(তাহরীরুল অসীলা ২৪১ পৃষ্ঠা)

(১৯) নামাযের অবস্থায় সালাম দেয়া জায়েয এবং সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। সালামের জওয়াব শোনাও ওয়াজিব।

(তাহরীরুল অসীলা ১৮৭ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

(২০) নামাযের অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে মুচকী হাসি জায়েয।
(তাহরীরুল অসীলা ১৮৮–১৮৯ পৃষ্ঠা)

(২১) নামাযের স্থানের সবটুকু পবিত্র হওয়া শর্ত নয়। শুধু সাজদা দেয়ার জন্য কপাল রাখার স্থানটুকু পবিত্র হওয়া নামায সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত। আর বাকী স্থান নাপাক থাকলে কোন দোষ নেই।
(তাহরীরুল অসীলা ১১৯ ও ১২৫ পৃষ্ঠা)

(২২) মোতা' বিয়ে জায়েয। ব্যাভিচারিনীর সাথে মোতা' করা জায়েয। রাতে না দিনে এবং একবার না অনেকবার তা নির্দিষ্ট সময় সহ শর্ত করে নেয়া জায়েয। (তাহরীরুল অসীলা ২৯১ ও ২৯২ পৃষ্ঠা)

(২৩) মোতা' বিয়ের জন্য সাক্ষী ও ঘোষণা করা শর্ত নয়। এ ব্যাপারে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে নেয়াও পুরুষের জন্য জরুরী নয় যে তার স্বামী আছে কিনা। মেয়ের পিতার অনুমতি ছাড়াই পুরুষ তার সাথে মিলন করতে পারে। (নেহায়া নাসীরুদ্দীন তুসী) ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

(২৪) সমস্ত ইমামীয়া শীয়াগণ তাদের ১২ ইমামের অনুসরণে মোতা' বিয়ে চিরকাল হালাল হওয়ার ব্যাপারে একমত।
(মাসায়েলে ফিকহিয়্যা ১০২ পৃষ্ঠা, আব্দুল হুসাইন শরফুদ্দীন)

(২৫) মোতা' বিয়ের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন উত্তরাধিকারী স্বত্ব হয় না। (যুবদাতুল আহকাম ২৪৮ পৃষ্ঠা)

(২৬) নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই মোতা' বিয়ে খতম হয়ে যায় এবং কোন তালাকের প্রয়োজন হয় না।
(যুবদাতুল আহকাম ২৪৮ পৃষ্ঠা, মাসায়েলে ফিকহিয়্যা ৮৮ পৃষ্ঠা)

মোতা' বিয়ে :

শীয়া ফিকহের কিছুসংখ্যক মাসায়েল নমুনা স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোতা' বিয়ে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ও বন্ধন সৃষ্টি হয়ে সমাজের গোড়া পত্তন হয়। এ জন্যই ইসলাম পবিত্র সমাজ গঠনের জন্য যিনা বা ব্যাভিচারকে হারাম করে বিয়েকে হালাল ও যরুরী করে দিয়েছে। জাহেলী যুগে বিয়ের নামে যিনার যে সমস্ত প্রথা ছিল মোতা' বিয়ে তারই একটি।

www.pathagar.com

মোতা' শব্দের অর্থ ভোগ করা। একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে শুধু নারী সম্ভোগের চুক্তিতে যে বিয়ে হয়, তাকেই মোতা' বিয়ে বলা হয়। এ বিয়ের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকার স্বত্ত হয় না। ব্যাভিচারিনীর সাথেও এ বিয়ে জায়েয। এ বিয়ে নির্দিষ্ট সময় শেষ হলেই খতম হয়ে যায় এবং কোন তালাকের প্রয়োজন হয় না এবং ইদ্দাত পালনেরও দরকার হয় না। নারীর স্বামী আছে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করা যরুরী নয়। এরূপ প্রথাকে বিয়েই বলা চলে না। যিনা ও মোতা' পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু নতুন ও পুরাতন শীয়াগণ এমন কি জনাব রুহুল্লাহ খোমেনীও এ পদ্ধতিকে বৈধ বিয়ে বলে তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শীয়া সমাজে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। আর যে সমাজে মোতা' বিয়ের নামে এভাবে যিনাকে বৈধ কাজ হিসেবে চালু রাখা হয়েছে তা যে কোন পবিত্র ও ইসলামী সমাজ হতে পারেনা সে কথা সহজেই অনুমেয়।

শারীয়াতের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ এক সাথে নাযিল হয়নি এবং এক সাথে চালুও করা হয়নি। প্রত্যেকটি আদেশ ও নিষেধ সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের সাথে সাথে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করার পর জারী করা হয়েছে। মোতা' বিয়েটা জাহেলী সমাজে চালু ছিল। এটাকে প্রকৃতপক্ষে যিনার একটা ভিন্ন রূপ দেয়া হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে সঠিক বিয়ের প্রচলন করার মাধ্যমে যৌন প্রয়োজন পূরণের ও পবিত্র সমাজ গঠনের ব্যবস্থা করলেন। তারপর যিনার সমস্ত দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দিলেন। সংস্কারের এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে মোতা' পদ্ধতিকে কিছুকাল বরদাশত করতে হয়েছে। তারপর তিনি যথাসময়ে এটাকে যিনা হিসেবে চিরদিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে মুসলিম উম্মাতের সর্বসম্মত অভিমত।

শীয়াগণ মোতা' পদ্ধতিকে বৈধ বিয়ে বলে প্রমাণ করার জন্য যেসব হাদীস পেশ করেন তা দ্বারা একথা অবশ্যই বুঝা যায় যে মোতা' পদ্ধতি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। কিন্তু উক্ত পদ্ধতিকে পরবর্তী সময়ে স্বয়ং নাবী (সঃ) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক হাদীসও রয়েছে। মুসলিম শরীফে সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

ان رسول الله صلعم اذن متعة النساء عام اوطاس ثم نهى عنها -

"রসূলুল্লাহ (সঃ) আওতাসের বছরে মহিলাদের সাথে মোতা' করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"

www.pathagar.com

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে:

ان رسول الله نهى عن متعة النساء -

"রসূলুল্লাহ (সঃ) মহিলাদের সাথে মোতা' করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"

এ হাদীসে একথাও আছে যে:

ان عليا قال لابن عباس انما المتعة كانت رخصة فى اول الاسلام نهى عنها رسول الله صلعم زمن خيبر -

"আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলেছেন যে মোতা' ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। এটাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের সময় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"

এ হাদীসটি যুহরী, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার থেকেও বর্ণিত আছে।

আল্লামা আবুবকর জাস্সাস (রঃ) তাঁর আহকামুল কুরআন গ্রন্থে আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে:

ان النبى صلعم قال فى غزوة تبوك ان الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والميراث -

"নাবী (সঃ) তাবুকের যুদ্ধে বলেছেন: আল্লাহ মোতা'কে তালাক, বিয়ে, ইদ্দাত ও উত্তরাধিকার আইন দ্বারা হারাম করে দিয়েছেন।"

উক্ত গ্রন্থে ইবনে উমার (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে:

نهى رسول الله صلعم يوم خيبر عن متعة النساء -

"রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের সময় মহিলাদের সাথে মোতা' করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।"

এসব সঠিক হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মোতা' পদ্ধতি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর প্রাথমিক যুগে ছিল এবং তিনিই তা পরে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর শীয়াদের প্রথম ও প্রধান ইমাম হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও এ পদ্ধতি হারাম হওয়ার ঘোষণা পাওয়া গিয়েছে। সাহাবীগণের মধ্যে শুধু ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ ঘোষণা জানার পূর্ব পর্যন্ত মোতা' পদ্ধতিকে জায়েয বলেছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

হারাম হওয়ার ঘোষণা জানার পর তিনিও তাঁর পূর্ব মত ত্যাগ করেছেন এবং মোতা' পদ্ধতিকে যিনা বলেছেন। আল্লামা আবুবকর জাস্‌সাস (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব (রঃ) এর এক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাতে একথা আছে যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) মোতা' পদ্ধতিকে যিনা বলেছেন। অতএব সমস্ত সাহাবীর (রাঃ) সর্বসম্মত অভিমত হয়েছে যে মোতা' পদ্ধতি হারাম।

বেলায়াতে ফাকীহ্

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে শীয়াদের জা'ফারী ফিক্‌হের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তার মুজতাহিদ পন্ডিতকে শীয়া ফাকীহ্ বলা হয়। আর সেই ফাকীহ্ হচ্ছেন শীয়াদের অদৃশ্য ইমামের স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। তাই উক্ত ইমামের পুনরাগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই প্রতিনিধি ফাকীহের সার্বিক ও একচ্ছত্র নেতৃত্ব চলতে হবে। এটাই হচ্ছে বেলায়াতে ফাকীহ। শীয়া মতবাদে বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদা একটি বিশেষ রহস্যজনক নতুন সংযোজন। শীয়া ফাকীহ ও অদৃশ্য ইমামের নায়েব জনাব রূহুল্লাহ খোমেনী আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া গ্রন্থে বেলায়াতে ফাকীহ্ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

فالفقهاء العدول هم وحدهم المؤهلون لتنفيذ احكام الاسلام واقرار نظمه واقامة حدود الله وحراسة ثغور المسلمين - وعلى كل فقد فوض اليهم الا نبياء جميع ما فوض اليهم وائتمنوهم على ما اوتمنوا عليه - (الحكومة الاسلامية - صفحه ٧٠)

"ইসলামের বিধান সমূহ জারী করার, তার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার, আল্লাহর হদ (শাস্তিমূলক আইন) সমূহ কায়েম করার এবং মুসলিমদের নগর বন্দর পাহারা দেয়ার জন্য একমাত্র বিশ্বস্ত ফাকীহ্‌গণই যোগ্য। মোট কথা নাবীগণকে যা কিছু সোপর্দ করা হয়েছে তাঁরা তা সবই তাদেরকে (ফাকীহগণকে) সোপর্দ করেছেন।" আর নাবীদেরকে যে আমানাত দেয়া হয়েছে তাদেরকেও তাই দেয়া হয়েছে। (আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া ৭০ পৃঃ)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

"وعلى كل حال فنحن نفهم من الحديث ان الفقهاء هم اوصياء الرسول (ص) من بعد الائمة وفي حال غيابهم وقد كلفوا بجميع ما كلف الائمة (ع) القيام به" - (الحكومة الاسلامية - صفحه ٧٥)

www.pathagar.com

"আর আমরা প্রত্যেক অবস্থায়ই হাদীস থেকে একথাই বুঝি যে ফাকীহ্-গণই ইমামদের পরে এবং তাদের অদৃশ্য অবস্থায় রসূলের (সঃ) নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। ইমামদেরকে যা কিছু কায়েম করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের-কেও সেই সব দায়িত্বই দেয়া হয়েছে।" (আল হুকুমাতুল ইসলামীয়া ৭৫ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখেছেন ঃ

و قد حصر الامام (ع) القضاء بمن كان نبيا اووصى نبى وبما ان الفقيه ليس نبيا فهواذن وصى نبى وفى عصر الغيبة يكون هوامام المسلمين وقائدهم والقاضى بينهم بالقسط دون سواه -" (الحكومة الا سلامية - صفحه ٨٦)

"আর ইমাম আঃ (আলী রাঃ) কোর্টের বিচার কার্যকে নাবী অথবা নাবীর নিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সীমিত করে দিয়েছেন। ফাকীহ্ তো নাবী নন। কাজেই তিনি নাবীর নিযুক্ত ব্যক্তি। আর তিনিই ইমামের অদৃশ্য থাকা কালে মুসলিমদের ইমাম, নেতা ও ন্যায় বিচারক হবেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এ মর্যাদা পাবেনা।"

এ সম্পর্কে শীয়া মুজ্তাহিদ ও মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফারও তার আকায়েদুল ইমামীয়া গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তিনি শীয়াদের বিশেষ পবিত্র স্থান নাজাফের কুল্লিয়াতুল ফিক্হের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৩৪–৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"وعقيدتنا فى المجتهد الجامع للشرائط انه نائب الامام عليه السلام فى حال غيبته - وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام فى الفصل فى القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه راد على الامام والراد على الامام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما جاء فى الحديث عن صادق ال البيت عليهم السلام -

فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا فى الفتيا فقط بل له الولاية العامة - فيرجع اليه فى الحكم والفصل والقضاء وذلك

www.pathagar.com

من مختصاته لا يجوز لاحد ان يتولاها دونه الا باذنه كما لا تجوز اقامة الحدود و التعزيرات الا بامره وحكمه ـ

و يرجع اليه ايضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام ومختصاته ـ

و هذه المنزلة اوالرياسة العامة اعطاها الامام عليه السلام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه فى حال الغيبة ـ ولذلك يسمى نائب الامام ـ،

"যে ব্যক্তির মধ্যে মুজ্তাহিদ হওয়ার সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে আমাদের আকীদা এই যে তিনি ইমাম (আঃ) এর অদৃশ্য থাকা অবস্থায় তার নায়েব (প্রতিনিধি)। তিনি একচ্ছত্র শাসনকর্তা ও সর্বপ্রধান নেতা। মানুষের বিচার-আচার ও শাসন কার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে ইমামের যে অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে তাই তারও আছে। আর তার প্রতিবাদকারী হচ্ছে ইমামের প্রতিবাদকারী। ইমামের প্রতিবাদকারী হচ্ছে আল্লাহর প্রতিবাদকারী। আর এটা আল্লাহর সাথে শির্কের পর্যায়ে পড়ে। এরূপ কথা আহলে বাইতের (আঃ) সাদেক (জাফার সাদেক) থেকেই বর্ণিত হাদীসে আছে।

কাজেই সমস্ত শর্ত সম্পন্ন মুজ্তাহিদ ব্যক্তি শুধু ফাত্ওয়ার ব্যাপারেই প্রধানতম কর্তা নন। বরং সার্বিক কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের অধিকার ও ক্ষমতাও তাঁরই। অতএব শাসন কার্য ও বিচার ফায়সালার ব্যাপারেও তারই শরণাপন্ন হতে হবে। আর এটা তার এমন একটি বৈশিষ্ট্য যে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এ ক্ষমতা লাভ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে তার হুকুম ও নির্দেশ ব্যতীত হদ (আল্লাহর দেয়া শাস্তিমূলক আইন) ও সরকারী শাস্তির বিধান কায়েম করা জায়েয নয়।"

"আর সমস্ত ধন সম্পদ ইমামের অধিকারে বিশেষ ক্ষমতাধীন হওয়ায় তারই নিকট আর্থিক ব্যাপারেও শরণাপন্ন হতে হবে।

আর ইমাম (আঃ) সমস্ত শর্ত সম্পন্ন মুজ্তাহিদকে এই মর্যাদা অথবা সার্বিক কর্তৃত্ব দান করেছেন। যাতে করে তিনি (মুজতাহিদ ফাকীহ্) তাঁর (ইমামের) অদৃশ্য থাকা অবস্থায় নায়েব (প্রতিনিধি) হন। এ কারণেই তাকে নায়েবে ইমাম নামে ভূষিত করা হয়।"

www.pathagar.com

জনাব রুহুল্লাহ খোমেনী ও মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফারের গ্রন্থদ্বয়ের এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদার মূল রহস্য, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এ আকীদার মাধ্যমে শীয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য যে বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম হয় তাই হচ্ছে শীয়াদের মতে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ। বেলায়াতে ফাকীহের অর্থ হচ্ছে শীয়া ফাকীহের নের্তৃত্ব। আর শীয়া ফাকীহ্ তো অদৃশ্য ইমামের নায়েব। এ অর্থে শীয়াদের মতে মুসলিম উম্মাহ নেতৃত্বহীন। কারণ তারা উক্ত আকীদা রাখেনা। কাজেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কায়েমের জন্য মুসলিম উম্মাতের সংগঠন সমূহের মাধ্যমে আন্দোলন চললেও সেগুলো শীয়াদের নিকট আকীদাগত ভাবে ইসলামী সংগঠন ও ইসলামী আন্দোলন বলে পরিগণিত নয়। ফলে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের বিরোধীতা করা তাদের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক।

বেলায়াতে ফাকীহ আকীদার আর একটি দিক এই যে অদৃশ্য ইমাম ও তার নায়েবের মধ্যে কার্যতঃ কোন পার্থক্য নেই। কারণ মর্যাদা, ক্ষমতা অধিকার, দায়িত্ব ইত্যাদি সব ব্যাপারেই উভয়কে সমান বলে বিশ্বাস করা হয়। কাজেই বাস্তবে নায়েবে ইমাম সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক হওয়ায় শীয়াদের ইমাম মেহ্দীরূপে অধিষ্ঠিত। সুযোগ হলেই নায়েবে ইমামের পক্ষে মেহ্দী হওয়ার দাবী করা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ইতিহাসে এরূপ দাবী কেউ কেউ করেছে বলে প্রমাণ আছে। অবশ্য বেলায়াতে ফাকীহ আকীদা বেশ সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ নীতি। কাজেই প্রথমে ফাকীহ্, তারপর নায়েবে ইমাম তারপর ইমামুল উম্মাহ তারপর ইমাম মেহ্দী রূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্য বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদা বড় রকমের তাকিয়্যাহ নীতি হিসেবে বেশ কার্যকর হতে পারে।

এরপর বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদা অনুযায়ী ফাকীহ যেহেতু নাবীর নিযুক্ত ব্যক্তি এবং নাবীর দায়িত্ব ও আমানতই ফাকীহকে দেয়া হয়েছে এবং ফাকীহের আনুগত্যই নাবীর আনুগত্য, কাজেই কার্যতঃ নাবী ও ফাকীহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ফাকীহ্ নাবী না হলেও নাবীর সমতুল্য। এখন বুঝা গেল যে বেলায়াতে ফাকীহ্ আকীদা কত সুদূর প্রসারী।

www.pathagar.com

শীয়া মতবাদে তাকিয়্যাহ নীতি

তাকিয়্যাহ নীতির অর্থ ঃ

তাকিয়্যাহ (تقية) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ভয় করা ও আত্ম রক্ষা করা। ভান করা, আত্মগোপন করা এবং কপটতা অবলম্বন করাও এর অর্থ।

তাকিয়্যাহ নীতি সম্পর্কে হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ১৭৪৬—১৮২৪ খৃঃ) তার "তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া" গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠায় শীয়াদের বহু ধোকাবাজী আলোচনা প্রসংগে ১০৭ নং ধোকায় লিখেছেন ঃ

"শীয়াদের ধোকাবাজীর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে তাদের তাকিয়্যাহ নীতি। তাকিয়্যাহ এর অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিজীবি ও সচেতন ব্যক্তিগণের নিকট তাদের বাতিল মতবাদ ও ভ্রান্ত আকীদা গোপন করে রাখা। এর উদ্দেশ্য এই যে বুদ্ধিজীবি ও সচেতন ব্যক্তিগণ যেন তাদের গোমরাহী ও মিথ্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের গোমর ফাঁক করে না দেন। জ্ঞানীগণের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয় যে তাদের ইমামদের এমন সব বর্ণনা ও কথা পাওয়া যায় যা তাদের (শীয়াদের) আকীদা ও বর্ণনার বিপরীত, তখন আত্মরক্ষার জন্য তাদের এটাই উত্তম জওয়াব হয় যে এটা ইমামদের তাকিয়্যাহ ছিল। তাকিয়্যাহ শীয়া ধর্ম মতের সব চেয়ে বড় নীতি।"

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রঃ) তাঁর "মিনহাজুস সুন্নাহ" প্রথম খণ্ডের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে শীয়ারা বলে থাকেন ঃ—

و يسمنا التقية وهو ان يقول احدهم بلسانه خلاف ما فى قلبه و هذا هو الكذب و النفاق -

"আমাদের (শীয়াদের) দ্বীন হচ্ছে তাকিয়্যাহ। আর তা এই যে কোন ব্যক্তির মনে যা আছে তার বিপরীত কথা মুখ দিয়ে বলা। আর এটাই তো মিথ্যা ও মুনাফেকী।"

শীয়া মতবাদে তাকিয়্যার গুরুত্ব ঃ

শীয়াদের এই তাকিয়্যাহ আকীদা সম্পর্কে শীয়া মুজ্তাহিদ মুহাম্মাদ রিযা মুযাফফার তার 'আকায়েদুল ইমামীয়া গ্রন্থের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"জাফর সাদেক (আঃ) থেকে বর্ণিত : তাকিয়্যাহ আমার ও আমার বাপ দাদার দ্বীন। যার তাকিয়্যাহ নেই তার কোন দ্বীন নেই।"

আলকাফী ২য় খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় আছে :

'আবু উমার আজমী থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেছেন : আমাকে আবু আবদুল্লাহ বলেছেন, "হে আবু উমার! দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগই হচ্ছে তাকিয়্যার মধ্যে। আর যার তাকিয়্যাহ নেই তার কোন দ্বীন নেই। নাবীয (একপ্রকার খাদ্য) ও মোযার উপর মাসেহ ব্যতীত আর প্রত্যেক বিষয়েই তাকিয়্যাহ রয়েছে।"

এসব উক্তি থেকে বুঝা যায় যে শীয়াদের সমস্ত প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনীতির ব্যাপারে এই তাকিয়্যাহ নীতির প্রয়োগ অপরিহার্যরূপে চলছে। এজন্য তাদের কোন্ কথা, কোন্ ওয়াদা ও কোন্ কাজ সত্য ও ঠিক তা নির্ণয় করা খুবই মুস্কিল। তাকিয়্যাহ নীতির কারণে প্রত্যেক ব্যাপারে তাদের মনে এক কথা আর মুখে আর এক কথা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই তাদেরকে কোন ব্যাপারেই বিশ্বাস করা যায় না।

এরপর একথাও বুঝা যায় যে শীয়াদের মতে তারা ছাড়া আর কেউ তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন না করায় মুসলিমই নয়। এভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহ তাদের নিকট অমুসলিম বলে পরিগণিত।

তাকিয়্যাহ নীতির প্রয়োগ :

শীয়া মতবাদের অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে এই তাকিয়্যাহ। শীয়াগণ মিথ্যা, মুনাফেকী ও কপটতার মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করে থাকেন। তারা তাদের যাবতীয় ইসলাম বিরোধী আকীদা এই তাকিয়্যাহ নীতির মাধ্যমে প্রয়োজন বোধে গোপন করে থাকেন। তারা নিজেদের গোমর ফাঁক হয়ে যাওয়ার ভয়ে সঠিক মুসলিম হওয়ার ভান করে থাকেন। মুসলিম উম্মাহকে ধোকা দেয়ার জন্য স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করেন।

আল্লাহ, রসূল, কুরআন, হাদীস, সাহাবা (রাঃ) এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে শীয়ারা নিজেদের মূল আকীদা গোপন করে রাখেন। এ উদ্দেশ্যে তারা কুরআনের আয়াতকে এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসকে নিজেদের আকীদার দলীল হিসেবে পেশ করে ধোকা দিয়ে থাকেন। আবার বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের অর্থকে বিকৃত করেও বর্ণনা করেন। এ সবই তাদের তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতে করে থাকেন।

www.pathagar.com

এছাড়া শীয়ারা নিজেদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতে বহু হাদীস রচনা করেছেন বলে মুসলিম উম্মাতের বিখ্যাত ও বিজ্ঞ হাদীস বিশারদগণ মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে হযরত আলী (রাঃ) ও তাদের অন্যান্য ইমামগণ তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে নিজেদের ইমামাতের দাবী না করে আত্মগোপন করেছেন। তাদের ইমাম মেহদী মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী নাকি তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতে আত্মগোপন করে আছেন। মোট কথা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই শীয়ারা তাদের তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে থাকেন।

শীয়া তাকিয়্যাহ নীতির দলীল :

এই ভ্রান্ত তাকিয়্যাহ নীতিকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য শীয়ারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন :

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين - و من يفعل ذلك فليس من الله في شيئ الا ان تتقوا منهم تقاة (ال عمران - ٢٨)

"মুমিনগণ যেন ঈমানদার লোকদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবেনা। অবশ্য তাদের যুলুম থেকে বাঁচবার জন্য তোমরা এরূপ করতে পার।" (আল ইমরান - ২৮)

আল্লামা আলূসী (রঃ) 'রূহুল মায়ানী' ২য় খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : এ আয়াত শীয়াদের তাকিয়্যাহ নীতির দলীল। تقاة শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুর ক্ষতি থেকে জান, মাল ও মান-সম্মানকে রক্ষা করা। অর্থাৎ কাফেরদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা। যদি কেউ তার দ্বীন ইসলাম কাফেরদের ভয়ে প্রকাশ করতে না পারে এবং অন্য কোথাও হিজরত করতে না পারে তবে তার ঈমান ও ইসলামকে গোপন করে রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এটা দুর্বলদের জন্য বিশেষ অবস্থায় অনুমতি মাত্র। ইসলামের মূল দাবী হচ্ছে সব অবস্থায় ঈমান ও ইসলামকে প্রকাশ ও ঘোষণা করা। (রূহুল মায়ানী ২য় ও ১২১ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা শীয়াদের তাকিয়্যাহ নীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শীয়ারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারের মাধ্যমে

www.pathagar.com

তাদের ভ্রান্ত তাকিয়্যাহ নীতিকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। তাই আল্লামা আলূসী (রঃ) আরও লিখেছেন ঃ

وحملوا اكثر افعال الائمة مما يوافق مذهب اهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة على التقية و جعلوا هذا اصلا اصيلا عندهم واسسوا عليه دينهم وهو الشائع الان فيما بينهم حتى نسبوا ذلك للانبياء عليهم السلام وجل غرضهم من ذلك ابطال خلافة الخلفاء الراشدين (روح المعانى جلد ثانى صفحه ١٢٣)

তারা (শিয়ারা) ইমামদের যে সমস্ত কাজ আহ্‌লুস্‌ সুন্নাত মাযহাব সম্মত এবং শীয়া মাযহাব খণ্ডনের দলীল হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোকে তাকিয়্যাহ নীতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর তারা এটাকে তাদের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই নীতির উপর তাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে এ নীতি এখন খুব চালু রয়েছে। এমনকি তারা এটাকে নাবীদের নীতি বলেও গণ্য করেন। এ দ্বারা তাদের মতলব হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফাত বাতিল করার অপচেষ্টা।" (রূহুল মায়ানী ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

শীয়াদের মতে আলী (রাঃ) তাঁর পূর্বের তিন খালিফার নিকট বাইয়াত করে তাদের খিলাফাত মেনে নিয়েছেন এই তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতে। তিনি তাঁর মেয়ে উম্মে কুলসুম (রাঃ) কে ওমর (রাঃ) এর সাথে তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতেই নাকি বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আলী (রাঃ) এসব দুর্বলতার বহু উর্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভিক ও সাহসী বীর পুরুষ। তাঁর সম্পর্কে শীয়াদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাঁকে যদি নাবী (সঃ) প্রথম খলিফা নিযুক্ত করে যেতেন তা হলে তিনি তা কারও ভয়ে তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করে গোপন রাখতেন না। তিনি যদি শীয়াদের তথাকথিত কুরআন মাস্‌হাফে ফাতেমা সংকলন করে থাকেন, তবে তাকে তাকিয়্যাহ নীতির ভিত্তিতে কিছুতেই গোপন রাখতেন না। মূল কুরআন প্রকাশ না করে মানুষকে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সুযোগ দেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। শীয়ারা এই সমস্ত কথা বলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করেছেন। আলী (রাঃ) যখন খালিফা হলেন, তখন তো আর কারও ভয়ে তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করার দরকার ছিল না। কিন্তু তখনও তো তিনি পূর্বের তিন জনের খিলাফাতের বিরুদ্ধে কিছুই

www.pathagar.com

বলেননি, বরং তাদেরকে সব সময় সমর্থন দিয়ে অনুসরণ করেছেন। যদি পূর্বের তিনজন অন্যায়ভাবে খলিফা হতেন, তা হলে এই নির্ভিক মহা পুরুষ আলী (রাঃ) তাকিয়্যাহ অবলম্বন করে উক্ত অন্যায় কাজের সমর্থন দিতেন না। ইমাম হুসাইন (রাঃ) যদি তাকিয়্যাহ নীতি অবলম্বন করতেন, তবে ইয়াযীদের বিরোধীতা করে শাহাদাত বরণ করতেন না।

হাফেজ ইবনে আসাকির (রঃ) তাঁর تاريخ دمشق ৪র্থ খণ্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে হাসান মোসান্না ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এক-জন শীয়াকে বলেছেন: "আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহ আমার পক্ষে সম্ভব করে দিতেন তাহলে আমি তোমাদের হাত ও পা কেটে দিতাম। তারপর তোমাদের কোন তওবা কবুল করতাম না।" শীয়া লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে কেন তাদের তাওবা কবুল করা হবেনা। তিনি বললেন: 'আমি জানি যে তারা তাকিয়্যাহ নীতির মাধ্যমে সত্য মিথ্যা সবই বলতে পারে। জেনে রাখ তাকিয়্যাহ হচ্ছে দুর্বল মুসলিমের জন্য অনুমতি মাত্র। আল্লাহর বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তাকিয়্যাহ নয়।'

শীয়াদের শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত গ্রন্থ নাহ্জুল বালাগাতে আছে যে আলী (রাঃ) বলেছেন:

علامة الايمان ايثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك ـ

"ঈমানের আলামাত হচ্ছে এই যে যেখানে মিথ্যার দ্বারা তোমার লাভ হবে সেখানে সেই সত্যকে অবলম্বন করা যার দ্বারা তোমার ক্ষতি হবে।"

উক্ত গ্রন্থে আরও আছে যে আলী (রাঃ) বলেছেন: 'আল্লাহর শপথ, আমাকে সারা বিশ্বের সমস্ত দুর্দান্ত শত্রুদের মোকাবিলা করতে হলেও আমি কিছুমাত্র পরওয়া করবনা এবং পিছু হটবনা।'

মুসলিম উম্মাতের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) এর এ দুটি উক্তি সামনে রেখে কেউ তাঁকে কাপুরুষ বা দুর্বল বলে ধারণা করতে পারে না। তিনি কিছুতেই সত্যের পরিবর্তে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকিয়্যাহ অবলম্বন করেন নি। একমাত্র শীয়ারাই তাঁর প্রতি মিথ্যা মহব্বতের বাহানায় তাঁর ভূমিকাকে তাকিয়্যাহ নীতির আওতায় ফেলে তার উচ্চ মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করেছেন। তিনি ভ্রান্ত তাকিয়্যাহ নীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন।

শীয়াদের শ্রেষ্ঠতম হাদীস গ্রন্থ আলকাফীতে কোদাইনীর বর্ণনা অনু-যায়ী শীয়াদের ইমামগণ নাকি ভবিষ্যত জানতেন। তাদের মৃত্যুর অবস্থা

www.pathagar.com

সম্পর্কেও অবগত ছিলেন এবং তারা নাকি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন। এমতাবস্থায় উক্ত ইমামগণ কোন্ ভয়ে তাকিয়্যাহ অবলম্বন করলেন এবং কেন তাঁদের ইমামাত প্রকাশ করলেন না, শীয়াদের নিকট এর কোন যুক্তি সংগত জওয়াব নেই।

রাজনৈতিক তাকিয়্যাহ ঃ

উল্লেখিত আয়াত থেকে যে তাকিয়্যাহ নীতি বের করা হয়েছে তা তো কাফেরদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফেরদের ভয়ে আত্ম রক্ষার জন্য দুর্বলদেরকে বৈধভাবে কৌশলে আত্ম গোপন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ নীতি মুসলিমদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে না। কিন্তু শীয়ারা মুসলিম উম্মাহকেই ভয় করেন এবং তাদের থেকেই তাদের ভ্রান্ত ঈমান ও আকীদা গোপন করেন। অপর দিকে তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলেন। যে সব কাফের রাষ্ট্র মুসলিম উম্মাহকে ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় তাদের সাথে শীয়াদের বন্ধুত্ব পূর্ব থেকেই চলে আসছে। তাতারীদের সাথে পূর্ণ সহযোগীতা করা এবং সেই সময়ই মুসলিমদের সাথে তাদের সম্পর্ক রাখা ছিল তাদের রাজনৈতিক তাকিয়্যাহ। তাই তারা তাদের ভ্রান্ত তাকিয়্যাহ নীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মুসলিম উম্মাহ্কে ধোকা দিয়ে থাকেন। বাহ্যতঃ মুসলিমদের ন্যায় নামায, হজ্জ ইত্যাদি যেমন পালন করেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মাধ্যমে মূল ভ্রান্ত শীয়া মতবাদ চালু করেন। মুসলিম উম্মাহকে খণ্ড বিখণ্ড করার জন্য মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের বিরোধীতা করা এবং কাফের মোশরেক রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা শীয়াদের চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু এটাকে তারা ঐক্য ও ইসলামের শ্লোগানের মাধ্যমে গোপন করে রাখেন। এটা হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক তাকিয়্যাহ।

বেলায়াতে ফাকীহ্ ও তাকিয়্যাহ ঃ

শীয়া নেতা জনাব রুহুল্লাহ খোমেনীর বেলায়াতে ফাকীহ নীতিকে একটা বড় রকমের শীয়া তাকিয়্যাহ রূপে গণ্য করা যায়। তিনি তার الحكومة الاسلامية গ্রন্থে বেলায়াতে ফাকীহ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে সব শীয়া আকীদা প্রকাশ করেছেন তার কতকগুলো পূর্বে উদ্ধৃতি সহ বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৪২ পৃষ্ঠায় তাতারী উযীর নাসীরুদ্দীন তুসীর জন্য আল্লাহর রহমাতের দোয়া করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ১২৮ পৃষ্ঠায় তিনি তুসীকে হুলাইন (রাঃ) এর

www.pathagar.com

সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন যে তিনি ইসলামের বিরাট খিদমাত করেছেন। এতে স্বাভাবিক ভাবেই বুঝা যায় যে বেলায়াতে ফাকীহ্ নীতিকে তাকিয়্যাহ হিসেবে গ্রহণ করে মূল ভ্রান্ত শীয়া মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই বেলায়াতে ফাকীহ ও তথা কথিত ইসলামী বিপ্লবের নামে লোকদেরকে শীয়া ধর্মে দিক্ষীত করার ব্যাপক চেষ্টা চলছে। ইরানী বিপ্লবকে জনাব খোমেনী অন্যান্য দেশে রফতানী করার হুকুমও দিয়েছেন। তাই বিশ্বের সমস্ত প্রকার শীয়াদেরকে সংঘবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। কাজেই বেলায়াতে ফাকীহ, ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী ঐক্যের প্রচার প্রপাগান্ডা শীয়া তাকিয়্যাহ নীতিরই পরিচায়ক।

শীয়াদের সম্পর্কে মনীষীবৃন্দের মন্তব্য

আল্লামা ইবনে তাইমীয়া 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' প্রথম খন্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন :

ইসলামের জ্ঞানী ও মনীষীবৃন্দ সর্বসম্মতভাবে মন্তব্য করেছেন যে শীয়া সম্প্রদায় সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী। তাদের মধ্যে মিথ্যাটা বহু পুরাতন। এজন্য ইসলামের ইমামগণ তাদের অসংখ্য মিথ্যা কথার কারণে তাদের বিশেষ পরিচিতি জানেন। আশহাব ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) (ইমাম মালেকের বিশিষ্ট ছাত্র) বলেছেন যে ইমাম মালেককে (রঃ) শীয়াদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : "তাদের সাথে কথা বলোনা এবং তাদের কাছ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করো না। কারণ তারা মিথ্যা হাদীস বলে।" হারমালা (রঃ) (ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট ছাত্র) ইমাম শাফেয়ী (রঃ) কে বলতে শুনেছেন : "শীয়াদের চেয়ে অন্য কাকেও আমি বেশী মিথ্যাবাদী দেখিনি।" ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর সমসাময়িক কাযী শারীক (রঃ) বলতেন : 'শীয়ারা মিথ্যা হাদীস রচনা করে এবং এটাকে তারা দ্বীনী কাজ বলে গণ্য করে। আ'মাশ (রঃ) বলেছেন : "আমি যে সমস্ত লোকদেরকে দেখেছি তারা শীয়াদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।" এসব মন্তব্য আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তা الابانة الكبرى গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (মিনহাজুস্ সুন্নাহ ১ম খন্ড ১৩—১৪ পৃষ্ঠা)

ইবনুল মোবারাক বলেছেন : "মিথ্যাচার শীয়াদেরই কাজ।"

(মুনতাকা - ৪৮০)

www.pathagar.com

এভাবে ইবনে কাইয়েম (রঃ), ইবনে কাসীর (রঃ), আবুবকর বাকেলানী (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে মালেক (রঃ), কাযী ইবনে আরাবী (রঃ), ইবনে হাযাম (রঃ) প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণ শীয়াদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আলকাতান (রঃ), আলী ইবনে মাদীনী (রঃ), ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুঈন (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), আবু যুর'আ (রঃ), আবু হাতেম রাযী (রঃ), নেছাঈ (রঃ), আবু হাতেম ইবনে হাব্বান (রঃ), আবু আহমাদ ইবনে আদ্দী (রঃ), দারুকুতনী (রঃ), ইব্রাহীম ইবনে ইয়াকুব আলজুযজানী (রঃ), ইয়াকুব ইবনে সুফ্ইয়ান আলকাস্বী (রঃ), আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ (রঃ), আল-ওকায়লী (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার মুসলী (রঃ), হাকিম নিশাপুরী (রঃ), হাফেয ইবনে আবদুল গনী (রঃ) প্রমুখ বহু বড় বড় ও বিখ্যাত হাদীস বিশারদ মনীষীবৃন্দ শীয়াদের মধ্যে মিথ্যার প্রচলন সবচেয়ে বেশী বলে মন্তব্য করেছেন। এমন কি আলী (রাঃ) ইমাম হাসান (রাঃ) ও হোসাইন (রাঃ) শীয়াদের সম্পকে যে তীব্র ও চরম কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তা স্বয়ং শীয়াদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। নাহজুল বালাগার ৭০ পৃষ্ঠায়, কোলাইনীর কিতাবুর রওজার ১০৭ পৃষ্ঠায় এবং তাবরাসীর কিতাবুল ইহ্তেজাজের ১৪৫ পৃষ্ঠায় শীয়াদের বিরুদ্ধে তাঁদের যে কঠোর মন্তব্য রয়েছে তা দ্বারা বুঝা যায় যে শীয়ারাই তাঁদের মূল শত্রু। বিশেষ করে ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লামা আলুসী বলেন যে ইমাম মালেক (রঃ) সূরা ফাতহ্ এর শেষ রুকু অনুযায়ী শীয়াদেরকে কাফের বলেছেন। কারণ তারা সাহাবীগণকে গালি দেন এবং তাদেরকে কাফেরও বলেন।

শীয়া মতবাদ প্রচারের নিয়ম

শীয়া মতবাদ প্রচারের নিয়ম পদ্ধতি স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে। তাই বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কর্মপন্থা ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তবে পূর্বের নিয়ম পদ্ধতি বর্তমানে হুবহু না থাকলেও মৌলিকভাবে সেগুলোই নতুন রূপ ধারণ করেছে। তাই হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) ১২০৪ হিজরীতে তাঁর

www.pathagar.com

"তোহফায়ে ইস্না আশারিয়া" গ্রন্থে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তাই সংক্ষেপে এখানে পেশ করা হল।

শীয়া মতবাদ প্রচারের পন্থা ঃ

শীয়াদের সমস্ত সম্প্রদায়ে শীয়া ধর্মমতের বহু প্রচারক থাকেন। তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন। তাদের দাওয়াতের চারটি পন্থা রয়েছে।

(১) ইলম বা জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে দাওয়াত দেয়া। এ পন্থায় তারা সমস্ত প্রকার সন্দেহ ও সংশয়কে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং সেগুলো সুন্দরভাবে যুক্তির মাধ্যমে আলোচনা করে মানুষের মন ও মগজে বদ্ধমূল করে দেন। তারা প্রত্যেক লোকের যোগ্যতা, অভ্যাস, রুচি ও মেযাজ অনুযায়ী কথা বলেন। মুসলিম উম্মাতের প্রমানাদিকে বিকৃত করে নিজ মতবাদের সমর্থনে এবং অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে থাকেন।

(২) মাল বা সম্পদ ব্যয় করে দাওয়াতী কাজ করা। এ পন্থায় তারা শীয়া ধর্মমত গ্রহণকারীদেরকে হাদীয়া, তোহফা ও পুরস্কার দেন। নও মুসলিমদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা ও আর্থিক সাহায্য দেয়াও তাদের দাওয়াতী কাজের কৌশল। এ ছাড়া নিজ ধর্মমতের লোকদেরকে চাকুরী ও বিভিন্ন পদমর্যাদা দানের মাধ্যমে সাহায্য করা এবং অপরদেরকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা ও হেয় প্রতিপন্ন করাও তাদের কাজের নিয়ম। মামলায় নিজ ধর্মমতের লোকদেরকে নির্দোষ এবং অপরদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে পক্ষপাতিত্ব করাও তাদের নিয়ম।

(৩) মুখের কথা দ্বারা দাওয়াতী কাজ। এর অর্থ হচ্ছে কেউ শীয়া ধর্মমতকে গ্রহণ করলে তার সাথে কোন স্বার্থের ওয়াদা করা। যে ব্যক্তি শীয়া ধর্ম মতের দিকে আকৃষ্ট হয় তার সাথে ভালবাসাপূর্ণ কথা বলা। আর যে ব্যক্তি শীয়া ধর্মমতের বিরোধী তার সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলা।

(৪) তলোয়ারের ব্যবহার ঃ—শীয়া ধর্মমতের বিরোধীকে হত্যা করা। মানুষকে উক্ত মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা। বিরোধীদের শাসকবৃন্দের সাথে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ করা।

শীয়া ধর্ম মতের যে প্রচারক উক্ত ৪ পন্থায়ই দাওয়াতী কাজ করেন তিনি কামেল বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে যান। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি খুব বিরল। অধিকাংশ শীয়া ধর্ম প্রচারক এক বা একাধিক পন্থায় দাওয়াতী কাজ করে থাকেন।

www.pathagar.com

কর্মসূচী :

(১) অপরের দলে ও সমাজে ভাংগন ও বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা।

(২) কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(৩) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং অর্থ লাভ করে নিজ ধর্মমত চালু করা।

(৪) ধনী ও বিত্তশালী লোকদেরকে নিজ ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে খোশামদ-তোষামদ করা।

(৫) নিজ ধর্মমতাবলম্বি বন্ধুদের সাথে ঐক্য বহাল রাখা এবং নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি না হয় সেজন্য পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করা।

(৬) মানুষকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তির আশ্বাস দান করা।

(৭) আহলে সুন্নাতের লোকদের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষের বীজ বপন করা এবং তাদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা। (তোহ্‌ফায়ে ইস্‌না আশারিয়া ৬০—৬২ পৃষ্ঠা)

শীয়াদের ক্যাডার বা স্তর :

(১) ইমাম : তিনি যে কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তি এবং তিনি অদৃশ্য পন্থায় সরাসরি জ্ঞান হাসিল করেন।

(২) হুজ্জাত : তিনি লোকের প্রকৃতি অনুযায়ী ইমামের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান বর্ণনা করেন।

(৩) বুমাস্সাহ্‌ : তিনি হুজ্জাতের মাধ্যমে জ্ঞান চুষে নেন। মাস্‌ শব্দের অর্থ চুষে নেয়া।

(৪) আবওয়াব : এদেরকে আহবায়কও বলা হয়। এদের আবার কয়েকটি স্তর আছে। সব চেয়ে উর্দ্ধতম আহবায়ক মুমিনদের মর্যাদার উন্নতি সাধন করেন এবং তাদেরকে হুজ্জাত ও ইমামের নিকটবর্তী করে দেন।

(৫) অনুমতি প্রাপ্ত আহবায়ক : এরা মানুষের নিকট থেকে ওয়াদা ও শপথ নিয়ে শীয়া ধর্মমতে শামিল করেন এবং তাদের জন্য জ্ঞানের রাস্তা প্রশস্ত করে দেন।

(৬) মোকাল্লাব : এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিকারী কুকুর। ইনি যদিও নিজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু শীয়া ধর্মমতের দাওয়াত

www.pathagar.com

দেয়ার অধিকারী নন। তার দায়িত্ব হচ্ছে যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মানুষের মত পরিবর্তন করে দেয়া এবং তাকে আহবায়কের নিকট টেনে নিয়ে আসা।

(৭) অনুসারী মুমিন ঃ ইনি মোকাল্লাব ও আহবায়কের চেষ্টায় ইমামকে স্বীকার করে নেন এবং মনে ইমামকে অনুসরণ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখেন।

দাওয়াতের স্তর ও কৌশল ঃ

(১) যারক্ (زرق) ঃ এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে কোন মানুষকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যে সে দাওয়াত পাওয়ার যোগ্য কিনা, তাকে দাওয়াত দেয়া ঠিক কিনা এবং তার উপর দাওয়াতের প্রভাব পড়বে কিনা।

(২) দাওয়াত দানকারী যাকে দাওয়াত দিবে তার নিকট নিজেকে সুপরিচিত ও প্রিয় করে তোলা এবং প্রত্যেকের প্রকৃতি মেযাজ অনুযায়ী তার মনকে তুষ্ট করা। যেমন কোন ব্যক্তির তাকওয়া ও পরহেযগারীর প্রতি বেশী ঝোঁক প্রবণতা থাকলে তার সামনে নিজেকেও বড় মোত্তাকী ও পরহেযগার রূপে পেশ করা এবং ইমামগণের পক্ষ থেকে তাকওয়া ও পরহেযগারীর সওয়াব বেশী বেশী বর্ণনা করা।

(৩)' তাশকীক্ ' ঃ অর্থাৎ বিপক্ষের আকীদা ও আমলে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা। যাতে বিপক্ষ তার নিজ আকীদা ও আমল ত্যাগ করে শীয়া ধর্মমতের দিকে আকৃষ্ট হয়।

(৪) প্রত্যেক ব্যক্তির কাছ থেকে এই ওয়াদা ও শপথ গ্রহণ করা যে সে যেন শীয়া ধর্মমতের মূল রহস্য প্রকাশ ও প্রচার না করে।

(৫) 'তাদ্লীস' ঃ অর্থাৎ বড় বড় আলেম ও বুযর্গ ব্যক্তিগণ সম্পর্কে দাবী করা যে তাঁরা শীয়া ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। যেমন সালমান ফারসী, আবু যার গিফারী, মেকদাদ, হাসান ইবনে সাবেত, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) অয়েস করনী, হাসান বাসারী ও ইমাম গাযযালী (রঃ) শীয়া ছিলেন বলে দাবী করা।

(৬) তা'সীস ঃ অর্থাৎ শীয়া আকীদা লোকের মন ও মগজে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং যুক্তি প্রমাণ গুলো বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পেশ করা যাতে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বিকৃত অর্থ সহজেই গ্রহণ করানো যায়।

www.pathagar.com

(৭) খুলা' ঃ অর্থাৎ চেহারার পর্দা খুলে ফেলে নির্লজ্জভাবে সাহাবী-গণকে (রাঃ) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভাষায় গালী দেয়া এবং মূল শীয়া ধর্মমতের সব কিছু সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।

(৮) সালখ্ ঃ অর্থাৎ পূর্বের সমস্ত আকীদা ও পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করানো এবং এর ভিত্তিতে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। (তোহ্ফায়ে ইসনা আশারিয়া ৭০—৭২ পৃষ্ঠা)

শেষ কথা

আলোচিত শীয়া আকীদা সমূহের কোন পরিবর্তন ও সংশোধন এ পর্যন্ত হয়নি। তদুপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে বর্তমানে শীয়া মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাতের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টির একটি বিশেষ কারণ হয়ে পড়েছে। তাই আজকের শীয়া মতবাদ ইসলামের জন্য পূর্বের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া শীয়াদের যায়দিয়া সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য ফেরকাগুলোর আকীদা আলোচিত ইসনা আশারিয়া আকীদার চেয়ে আরও বেশী ভ্রান্ত। এ বইতে ইসনা আশারিয়া শীয়া মতবাদের কতিপয় মৌলিক আকীদা সম্পর্কে আপাততঃ সংক্ষেপে যে আলোচনা করা হয়েছে তাই বর্তমানে যথেষ্ট হতে পারে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে বিস্তারিতভাবে পূর্ণ আলোচনা করা যাবে।

আল্লাহ সকলকে সমস্ত প্রকার ভ্রান্ত আকীদা থেকে পবিত্র হয়ে দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার তাওফীক দিন।

আমিন।

www.pathagar.com